কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

এপ্রিল ১৯৮৬

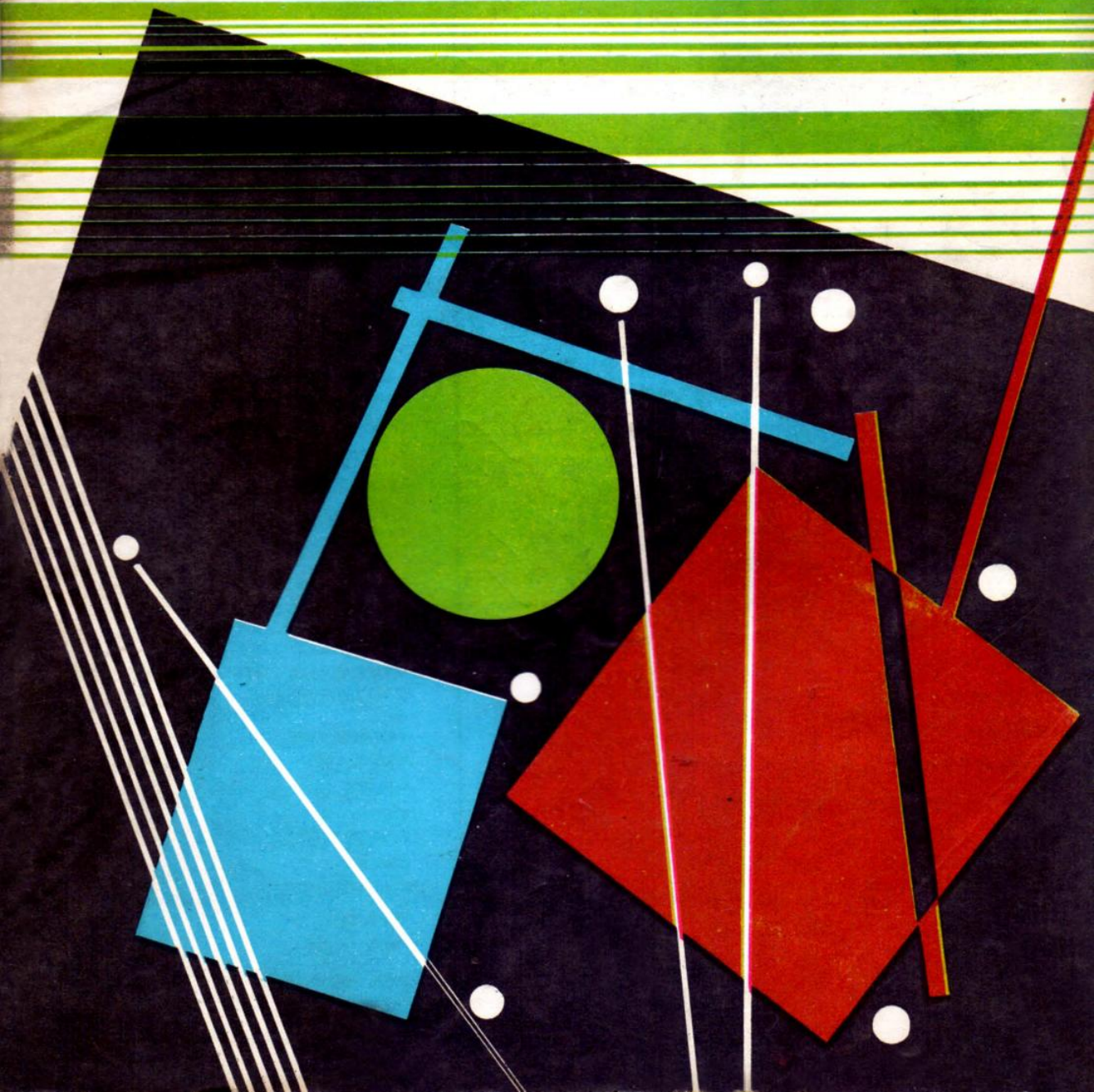

রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক নির্বাচিত গ্রন্থতালিকা—৮০-৮১-৮২, ৮৩-৮৪

অন্নদাশঙ্কর রায়	লালন ও তাঁর গান	১০·০০
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	বনে জঙ্গলে	১৫·০০
সমরজিৎ কর	কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান	২১·০০
অন্নদাশঙ্কর রায়	হট্টমালার দেশে	৮·০০
গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য	পশু পাখী কীটপতঙ্গ	১০·০০
অরূপরতন ভট্টাচার্য	রোবোট এল কেমন করে	৮·০০
সুনির্মল বসু	রোমাঞ্চের দেশে	৬·০০
সমরজিৎ কর	নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী	২০·০০
প্রবোধবন্ধু অধিকারী	চিৎপুর চরিত্র	২৫·০০
শীতাংশু মৈত্র	যুগন্ধর মধুসূদন	১৫·০০
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভেপান্তর	২০·০০
অমরনাথ রায়	জ্ঞান-বিজ্ঞানের মজার খেলা	১০·০০
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	ছোঃ সন্দীপন পাঠশালা	১০·০০
অমরনাথ রায়	সংখ্যা নিয়ে খেলা	৮·০০
আর্থার কোনান ডয়েল	কিশোর গোয়েন্দা গল্প	১০·০০
আর্থার কোনান ডয়েল	কিশোর রহস্য গল্প	৮·০০
প্রেমেন্দ্র মিত্র	ঘনাদা বিচিত্রা	২০·০০
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	অপুর ছেলেবেলা	১০·০০
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	কিশোর অপু	২০·০০
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	ছোটদের অপরাজিত	১০·০০
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	ছোটদের কাশীনাথ	১০·০০
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	পশুপক্ষী	২০·০০
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	বাঙলার ডাকাত (১-৪)	৩২·০০
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	খুকুমণির ছড়া	১০·০০

সাহিত্য সংগ্রহ ও বিবিধ প্রবন্ধ
অন্নদাশঙ্কর রায়
স্বাধীনতার পূর্বাভাস ১৫
প্রবোধবন্ধু অধিকারী
চিৎপুর চরিত্র ২৫
অনন্ত সিংহ
কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত ২০
মণি বাগচি
সপার্ষদ শ্রীরামকৃষ্ণ ১৬
সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়
মুনশী রামরাম বসু ২০
শীতাংশু মৈত্র
যুগন্ধর মধুসূদন ১৫
রমাপদ চৌধুরী
আমরা সবাই ১০
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
পুরাতন গদ্যগ্রন্থ সঙ্কলন ১ম ও২য় খণ্ড ৩৫
বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
বিনোদ বিনোদিনী ২০
বিপিনবিহারী গুপ্ত
রবীন্দ্র সঙ্গ প্রসঙ্গ ৩০
শ্রীম কথিত
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ২৫
উপন্যাস
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
মানুষের সত্যাসত্য ৩০
কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়
থমকে কেন দাঁড়িয়ে ১০
দক্ষিণারঞ্জন বসু
কখনো সম্রাজ্ঞী ৮
অমিত রায়
দুই রমনীর গপ্পো ১০
সুকুমার ভট্টাচার্য
সবাই মিলে ৬

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-৯

ছবি, ছড়া ও গল্পের বই
যোগীন্দ্রনাথ সরকার
খেলার সাথী ৬·০০
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
কথামালার গল্প ৪·০০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
টেনিদার কুট্টিমামা ৫·০০
ধীরেন বল
ঠেকে হাবুল শেখে ৫·০০
দেবাশীষ বল
বাঘ সাপ হাতি ৬·০০
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
মনোহর ডাকাত ৬·০০
প্রেমেন্দ্র মিত্র
কচিমুখের ছড়া ৫·০০
দক্ষিণারঞ্জন বসু
ঠাকুমার ঝুলি ৮·০০
ঠাকুরদাদার ঝোলা ১০·০০
খগেন্দ্রনাথ মিত্র
ছোটদের রামায়ণ ১০·০০
ছোটদের মহাভারত ১০·০০
মনি বাগচি
অমর চরিত কথা ৮·০০
অখিল নিয়োগী
ছবিতে সাধারণ জ্ঞান ১০·০০
তপনায়ন ঘোষ
ডেড্ লাইন ৩১ অক্টোবর ১০·০০
হাননান আহসান
স্পোর্টস ক্যুইজ ৮·০০
রঞ্জন সক্লাসিক্স কমিক্স
অগ্নিগিরির গুপ্তধন ৩·০০
শেষ বিজয় ৩·০০
কলঙ্কিত ছোরা ৩·০০
মুক্তিযোদ্ধা ৩·০০
মৃত্যু মাতাল অরণ্য ৩·০০
সাগর শয়তান ৩·০০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ

জ্ঞান ও আনন্দের আশ্চর্য সমীকরণ

কিশোর জ্ঞান ও বিজ্ঞান

পঞ্চম বর্ষ 12শ সংখ্যা April '86

আগামী
সংখ্যা থেকে
নিয়মিত
বিভাগের
সঙ্গে
যুক্ত হচ্ছে
আরও
অনেক
নতুন বিভাগ

প্রধান সম্পাদক : সমরজিৎ কর
সম্পাদক : রবীন বল
সহ-সম্পাদক : জয়ন্ত দত্ত

সূচীপত্র

চিঠিপত্র 4 : দপ্তর থেকে : পঙ্গপাল ॥ সমরজিৎ কর 7

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প

গুপ্তধন ॥ সঙ্কর্ষণ রায় 29 : গাছ ॥ শ্রীধর সেনাপতি 20

বিশেষ রচনা

ইলেক্ট্রনিক্স্ এর কলাকৌশল ॥ অলক চক্রবর্তী 17

পড়াশোনা

জারণ বিজারণ ॥ বিবেক রায় 25 : পদার্থ বিদ্যার কথা ॥ অজয় চক্রবর্তী 26 : বর্গ সংখ্যার প্রতিসমত্ব ॥ সজল চক্রবর্তী 28 : অভিব্যক্তি বা বিবর্তন ॥ দিনোজ কুমার দে 37

ছবিতে গল্প

ক্ষুদে বৈজ্ঞানিক ॥ দিলীপ দাস 21 : মঙ্গল গ্রহে ঘনাদা (কাহিনী : প্রেমেন্দ্র মিত্র) ॥ গৌতম কর্মকার 41

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী

স্বাণ্টে আগস্ট আরোনিয়াস : প্রবাসে ভারতীয় বিজ্ঞানী গোবিন্দজি ॥ অমরনাথ রায় 32

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবিধ রচনা

বৃটিশ নৌশক্তির শ্রেষ্ঠত্বের রহস্য ॥ অরুণ কুমার দত্ত 13 : বুদ্ধি নিয়ে খেলা ॥ পার্থসারথি চক্রবর্তী 15 : জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই ॥ বিমান বসু 16 তুরীয়ান, তুঙ্গীয়ান প্রাণীজগতে ॥ রাজা রায় 49 : বিজ্ঞান সংবাদ 51 খুদে বিজ্ঞানীদের মেলা ॥ কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 28

আবিষ্কারের গল্প

মৌল আবিষ্কারের পিছনে ॥ দীপঙ্কর বসু 38

রঙ্গীন ফিচার

চন্দনা ॥ সুধীন সেনগুপ্ত 11 : ক্লিরোডেনড্রন ॥ এণাক্ষী বিশ্বাস 12 টোপাজ ॥ অমরনাথ রায় 53 : ফিঙে ॥ রেবতীভূষণ 54

জীবজন্তু ও গাছপালা

চিতা ॥ ধীরেন দত্ত 6 : বিচিত্র গাছপালা ॥ অরবিন্দ ঘোষ 52

ধারাবাহিক রচনা

অমলথীয়ার রহস্য ॥ নিরঞ্জন সিংহ 33
কেন্দ্রীয় সড়ক গবেষণা ॥ বিমান বসু 9

ছোটদের দপ্তর

ক্যুইজ কনটেস্ট ও আই কিউ টেস্ট-এর উত্তরদাতাদের নাম 55 : আই কিউ টেস্ট 57 : ক্যুইজ কনটেস্ট 57 : মডার্ন অ্যানসার ইনডিকেটর ॥ কুন্তল পাল 56 : ইলেকট্রনিক ডোর বেল ॥ মনোজ দাস 59 : প্রশ্নোত্তর ॥ সুধাংশু পাত্র 60 শব্দকুটের সমাধান 62

ছবি এঁকেছেন : অলয় ঘোষাল

চিঠিপত্র

রতন কুমার ঘোষ তাঁর 'যক্ষ্মারোগের ঔষধ আবিষ্কারের কাহিনী' (কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান ঃ পঞ্চম বর্ষ 7ম সংখ্যা, ডিসেম্বর 1985) শীর্ষক আবিষ্কারের গল্প-এ লিখেছেন "...1944 সালে জেকব ওয়াক্সম্যানকে বিশ্বের সর্বোচ্চ সম্মান নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।" পৃষ্ঠা 28

কিন্তু নোবেল পুরস্কার বিজয়ীর তালিকায় জেকব ওয়াক্সম্যান-এর নাম দেখা যায় না। তাছাড়া তিনি কি বিষয়ে নোবেল পুরস্কার পান তাহাও লেখক উল্লেখ করেননি।

1952 সালে ঔষধবিজ্ঞান (শারীরবিজ্ঞান)-এ সেলম্যান আব্রাহাম ওয়াক্সম্যান (Selman Abraham waksman) নোবেল পুরস্কার পান।

অধ্যাপক ডঃ সেলম্যান আব্রাহাম ওয়াক্সম্যান ছিলেন একজন প্রখ্যাত মৃত্তিকা-বিজ্ঞানী (soil-scientist)। তিনি 1888 সালের জুলাই মাসে রাশিয়ার কিয়েভ-এর অন্তর্গত প্রিলুকু নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। 1916 সালের মার্চ মাসে তিনি আমেরিকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। তিনি M Sc (Agri) ডিগ্রী লাভ করার পর ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Ph.D. ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি বীজাণু প্রতিষেধক ঔষধ (Streptomycin) আবিষ্কার করেন। ড. সেলম্যান আব্রাহাম ওয়াক্সম্যান 1973 সালের 17ই আগস্ট আমেরিকার নিউ বার্নস্উইক-এ মারা যান।

দ্রষ্টব্য : Assam Agrian.

লেখকের জ্ঞাতার্থে 1944 সালে বিজ্ঞান-এ যাঁরা নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, তাঁদের নাম নিচে উল্লেখিত হ'ল।

চিকিৎসা বা ঔষধবিজ্ঞান (Medicine / Physiology)

(1) জোসেফ আয়ার্ল্যাঙ্গার (Joseph Erlanger) ঃ আমেরিকা
(2) হার্বার্ট স্পেন্সার গ্যাসার (Herbert Spencer Gasser) ঃ

পদার্থবিজ্ঞান (Physics)

(1) ইসিডোর আইজাক রোবি (Isidor Isaac Rabi) ঃ আমেরিকা

রসায়ন বিজ্ঞান (Chemistry)

(1) অটো হান (Otto Hahn) ঃ জার্মানী।

দ্রষ্টব্য ঃ (1) বিজ্ঞান ভারতী ঃ দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।
(শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ ঃ এপ্রিল, 1983)
(2) Competition & Job Aid, September 1983
(3 Careers Digest, November 1981
(4) Junior Science Digest, November 1978 ইত্যাদি।

সমীর কুমার সূত্রধর, শান্তিধাম কালীবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়। নিউকলোনী, বঙাইগাওঁ 783380।

ডিসেম্বর '85 সংখ্যায় রতন কুমার ঘোষ যক্ষ্মারোগের ঔষধ আবিষ্কারের কাহিনীতে লিখেছেন যে, 1944 সালে জেকব ওয়াক্সম্যানকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। সালটা কি 1944 না 1952 ?

অনিন্দ্য দাস, 22 বারোয়ারীতলা মেন রোড, কল-10।

ফিরোমেন কি ?

অক্টোবর-নভেম্বর সংখ্যায় প্রশ্নোত্তর বিভাগে 'ফিরোমেন কি'—এই প্রশ্নের যা বলা হয়েছে তাতে বক্তব্য পরিষ্কার হয় না। এই সম্পর্কে তাই কিছু বক্তব্য রাখছি।

ফিরোমেন এক প্রকার উগ্র গন্ধযুক্ত রাসায়নিক পদার্থ—যা প্রাণী দ্বারা খুব অল্প পরিমাণে ক্ষরিত হয়। ইহা একই গোত্রের দুই প্রাণীর মধ্যে বৃদ্ধি, জনন, এবং আচরণজনিত বিশেষ ধরনের ক্রিয়াকলাপে সহায়তা করে। ফিরোমেন সম্পর্কিত সর্বপ্রথম এবং সর্বোৎকৃষ্ট পরীক্ষা হয় লেপিডপটেরা বর্গের রানী মৌমাছির আচরণে। এই রানী মৌমাছি Queen bee substance নামক এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে।

এই পদার্থ শ্রমিক মৌমাছি গ্রহণ করলে ইহাদের ডিম্বাশয় গঠনে বাঁধার সৃষ্টি হয়। এবং তারা রানী মৌমাছির কুটুরী গঠন বন্ধ করে দেয়।

সর্বেন্দু সিংহ রায়, হরিপাল হুগলী

সমুদ্রের জল নীল কেন ?

সেপ্টেম্বর সংখ্যার প্রশ্নোত্তর বিভাগে 'সমুদ্রের জল নীল কেন?' প্রশ্নের উত্তরে সুধাংশুবাবু পরিষ্কার ব্যাখ্যা দেন নি। সমুদ্রের জলের উপরিভাগের উপর পড়া সূর্যালোকের বিকিরণ ঘটে এবং সূর্যের সাতটি রঙের মধ্যে নীল রঙটি এই সময়ে সবচেয়ে বেশি বিচ্ছুরিত হয় বলে সমুদ্রের জল নীল দেখায়।

শুভেন্দুলাল মৈত্র, মধুমিতা দত্ত। কল্যাণী, নদীয়া।

মডেল সম্পর্কে

2/61 সূর্যনগর, কলকাতা 40 থেকে পিকু চ্যাটার্জী, 15 রামধন মিত্র লেন, কল-4 থেকে দেবী দত্ত এবং আরও অনেকে 'মাছ ধরা যন্ত্র' ও 'অডিও

অ্যামপ্লিফায়ার'-এর বর্ণনা ও ছবিতে অস্পষ্টতা থাকায় নির্মাতাদের ঠিকানা জানতে চেয়েছেন। তাঁদের ঠিকানা হল

শুভাশিষ ঘোষ, পোঃ + গ্রাম—
কেশবপুর, জেলা হুগলী।

ধূমকেতু

জানুয়ারি '86 সংখ্যার কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান (বিশেষ সংখ্যা : হ্যালির ধূমকেতু) খুবই চিত্তাকর্ষক এবং প্রশংসাযোগ্য। বিশেষতঃ জয়ন্তবিষ্ণু নারলিকার-এর 'ধূমকেতু' শীর্ষক বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পটি (অনুবাদ : অমিত রায়)। বর্তমান বিজ্ঞান নির্ভর পৃথিবীতে যুক্তিবাদী উন্নত চিন্তাধারা এবং ভ্রান্ত যুক্তিহীন চিন্তাধারা কিভাবে পাশাপাশি বয়ে চলেছে তার সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে গল্পটিতে। এজন্য লেখককে, অনুবাদককে এবং কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই। রূপছন্দা দাস, রামকৃষ্ণ মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল।

হ্যালির ধূমকেতু সংখ্যা পড়ে ভাল লাগল। ধূমকেতুর গতিপথ, এবং উল্কাপাতের মতই ধূমকেতুর পতন হয় কিনা জানতে ইচ্ছুক।

মেহেবুল ইসলাম।
পোঃ বারুইপুর, 24-পরগনা।

মহান পিরামিড

পিরামিডের তলায় যদি পচনশীল দ্রব্য অবিকৃত থাকে, এবং বিষয়টি যদি বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণিত সত্য হয়, তবে আজকের দিনে ফ্রিজ বা রেফ্রিজারেটরের কোন প্রয়োজন থাকছে না। কারণ, একটি প্রমাণ মাপের ফ্রিজ এর যা দাম পড়ছে সেই তুলনায় একটা প্রমাণ মাপের পিরামিড তৈরি করতে দাম পড়বে মাত্র তার দশ ভাগ।
যদি তাই হয় তাহলে বিজ্ঞানীরা কেন এটাকে কাজে লাগালেন না ?

প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়,
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া। কল-1

জ্ঞান ও আনন্দের আশ্চর্য সমীকরণ

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান-এর নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

● বিদ্যালয়পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী ও সর্বসাধারণের উপযোগী জনপ্রিয় বিজ্ঞানের রচনা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিত হয়।

● পত্রিকায় প্রকাশিত বিষয় অনুযায়ী শব্দসংখ্যা হওয়া প্রয়োজন।

● রচনার সঙ্গে উপযুক্ত ছবি থাকা প্রয়োজন।

● প্রকাশিত রচনার বিষয়ে সর্বপ্রকার দায়িত্ব লেখকের।

● অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয় না।

● এক বছরের মধ্যে প্রকাশিত না হলে প্রেরিত রচনাটি অমনোনীত হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।

গ্রাহক ও এজেণ্টদের প্রতি

● কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রতি ইংরাজী মাসের গোড়ার দিকে প্রকাশিত হয়।

● প্রতি সংখ্যার মূল্য 3·50 টাকা। বারো মাসের বৈশাখ-চৈত্র গ্রাহক চাঁদা 40·00 টাকা। হাতে বই নিলে গ্রাহক চাঁদা 35·00 টাকা। শারদসংখ্যার মূল্য পৃথক।

● গ্রাহকদের ডাকমাশুল লাগবে না। Under Certificate of Posting-এ গ্রাহকদের বই পাঠানো হবে। যারা রেজিস্ট্রী ডাকে নেবেন তাদের অতিরিক্ত 30·00 টাকা পাঠাতে হবে।

● M. O. বা Bank Draft KISHORE JNAN BIJNAN-এর নামে পাঠাতে হবে।

● 25 কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। কমিশন শতকরা 25 টাকা।

● ভি. পি. পি বা ব্যাঙ্ক মারফৎ পত্রিকা পাঠানো হয়। সংখ্যাপিছু গ্রাহকদের 1·00 টাকা করে সিকিউরিটি ডিপোজিট রাখতে হবে।

86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-9

চিতা

ধীরেন দত্ত

1942 সাল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমি আসামে অনুদির বাড়ীতে কিছুদিন ছিলাম। অনুদির স্বামী রেনজ অফিসার নির্মলদা আমাকে সাদরে আহ্বান করলেন। ওখানকার বাসিন্দা বলতে অনুদি, বিমলদা, আর ফরেস্টগার্ড দয়ারাম। দয়ারামের একমাত্র ছেলে সিধুয়া, মধ্যে মধ্যে দেখা দিত, কিন্তু পরক্ষণেই ভেগে পড়ত। দয়ারামের দুঃখ ছেলেটা মানুষ হল না, দিনরাত জঙ্গলে জঙ্গলে বাঁশি বাজিয়ে ঘুরে বেড়ায়, আর গাঁজা ও মদের আড্ডায় মজে থাকে। ফরেস্ট বাংলোয় থাকলে, এটা ওটা কাজে দু পয়সা আসে আর সাহেবরা খুসী থাকলে পরে একটা হিল্লেও হয়ে যেতে পারে। সকলের পরামর্শে দয়ারাম সিধুয়ার বিয়ে দিয়েছে দূর পাহাড়ী গাঁয়ের মেয়ে কাঞ্চির সাথে।

একবোঝা চ্যালা করা লকড়ি নিয়ে কাঞ্চি এল সকালে অনুদির বাংলোয় অনুদি দেখিয়ে বললেন, 'এই হল কাঞ্চি, সিধুয়ার বৌ'। কাঞ্চি ঘোমটা টেনে, মুচকি হেসে চলে গেল।

বনের মধ্যে নির্জন ফরেস্ট বাংলোয় কয়েকদিনের মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠলাম।

রেনজ অফিসের বাইরে ঝর্ণার জল জমে জমে একটা তালাও বা ডোবা তৈরি হয়েছে, তার পাশেই ফরেস্টের ফোর্থক্লাস স্টাফ অর্থাৎ দয়ারামদের কোয়ার্টার। সেদিন দুপুরের একটু পরে একটা বই নিয়ে তালাওয়ের একধারে একটা পাথরেরর চ্যাঙড়ের ওপর বসে পড়েছি। ওর মা তালাওয়ের এ পাশে ঘাটে বসে একগোছা কাপড় কাচছে, একটু পরে কাঞ্চি এল কয়েকটা বাসন কোসন নিয়ে। হঠাৎ আমার চোখে পড়ল জঙ্গলের পাশা দিয়ে একটা চিতা গুড়ি মেরে মেরে সিধুয়ার মায়ের দিকে এগুচ্ছে কাঞ্চি হঠাৎ দাড়িয়ে উঠে চ্যাঁচাতে লাগল, শের! শের! আমি নিশ্চল বনে আছি। মুহূর্তে সিধুয়া কোমর থেকে ভোজালিটা টেনে নিয়ে লাফ দিয়ে এসে দাঁড়াল কাঞ্চি আর চিতাটার মাঝাখানে। চিতাটা ঝাঁপিয়ে পড়ল সিধুয়ার ওপর। সিধুয়াও মুহুর্মুহু ভোজালির কোপ লাগাচ্ছে চিতাটার মাথায়। আমি দৌড়ে বাংলোয় গিয়ে বিমলদাকে খবর দিলাম। বিমলদা রাইফেল লোড করে নিয়ে এলেন, কিন্তু গুলি করবেন কেমন করে গুলি চালালে তাতে সিধুয়াও বিদ্ধ হতে পারে। ওরা দুজনে জড়াজড়ি করে এ ওকে আক্রমণ চালাচ্ছে। সমস্ত জায়গাটা রক্তে ভিজে গেছে, একটু পরে চিতাটা নেতিয়ে পড়ল, সিধুয়ার অবস্থাও ভীষণ খারাপ, সেও নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। সিধুয়াকে জিপে তুলে নিয়ে আমরা রওনা দিলাম ডিব্রুগড় হাসপাতালের দিকে। সেখানে পৌছালে ডাক্তার বন্ধুরা ওকে মৃত বলে ঘোষণা করলেন। সিধুয়ার মৃতদেহ নিয়ে রাত 1 টায় আমরা যখন টাইপুডিয়ায় ফিরলাম ওদের পরিবারে যখন কান্নার রোল পড়ে গেছে।

অনেকের ধারণা চিতা অর্থাৎ শিকারী চিতা আর চিতাবাঘ বা লেপার্ড একই জাতের প্রাণী, কিন্তু এ তথ্য ঠিক নয়। চিতারা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের জীব। চিতাবাঘ থেকে এরা বেশি লম্বাটে আর দ্রুত দৌড়ানোর জন্য প্রকৃতি এদের দিয়েছে লম্বা লম্বা ঠ্যাং এরা ঘণ্টায় 45 মাইল বেগে দৌড়াতে পারে। এদের নাছোড়বান্দা স্বভাবের জন্য কি কারণে ছুটিয়ে ছুটিয়ে কাবু করে সাবাড় করে।

মানুষের বাড় বাড়ন্তের জন্য জঙ্গল উৎসাদন করে এবং তার মহিষের চারণক্ষেত্র বাড়িয়ে মানুষ জঙ্গলের এলাকা দারুণ ভাবে কমিয়ে আনল, তাই চিতল, কৃষ্ণসার আর নীলগাইদের সংখ্যাও কমে যেতে লাগল। বনে বাঘ চিতাবাঘ আর চিতাদের খাদ্যভাবও দেখা দিল, তারা বনের উপকণ্ঠের গ্রামে হানা দিয়ে গৃহপালিত পশুদের ওপর অত্যাচার আরম্ভ করল। বাঘের চেয়ে চিতাবাঘ আর চিতারা তাদের দ্রুতগামীতার জন্য আর আত্মগোপন করার ক্ষমতার জন্য মানুষের কাছে আপদ স্বরূপ হয়ে দাঁড়াল। চিতা আর চিতাবাঘেরা আবার গাছে উঠতে ওস্তাদ, দেখা গেছে একটা চিতা একটা হরিণ মেরে মড়িটাকে নিয়ে তালগাছ বেয়ে তার মাথায় উঠে লুকিয়ে আছে।

আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র আর রাইফেলের প্রচলনের সাথে সাথে মানুষ নির্বিচারে চিতা আর চিতাবাঘদের নিধন আরম্ভ করল, সেই সাথে বাঘও কিছু কিছু স্থানে মারা পড়তে লাগল। শেষ পর্যন্ত বাস্তার জেলার কোরিয়া নামক স্থানে এক সখের শিকারী জোরালো সার্চ লাইট ফেলে একজোড়া চিতাকে হত্যা করে। সেই শেষ তারপর আর চিতাকে কেউ ভারতের কোথাও দেখেনি। প্রকৃতির অপূর্ব এক সৃষ্টি মানুষের হাতে চিরতরে অবলুপ্ত হয়ে গেল। অথচ মানুষের সাধ্য নেই নগন্যতম একটা প্রাণীকে নতুন করে সৃষ্টি করতে পারে॥

পোঃ—সন্দেশখালি, 24 পরগনা।

।। পঙ্গপাল ।। সমরজিৎ কর

দপ্তর থেকে

কিছুদিন আগে ছোট্ট একটি খবর চোখে পড়ল। সৌদি আরব, ইয়েমেন, আরব রিপাবলিক, ইথিওপিয়া, সোমালিয়া এবং সুদানে পঙ্গপাল দেখা গেছে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছে তোড়জোড়। রাক্ষসী এই পতঙ্গদের যাতে এখনই ধ্বংস করা যায়, সে নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছেন এখন বিজ্ঞানীরা।

এইতো, বছর সাত আগে কি কাণ্ডই না হয়ে গেল ইথিওপিয়ায়। ভাবতে গেলে যেন শিউরে ওঠে গা। সেটা 1979 সাল। ইথিওপিয়ার আকাশে সে বছর দেখা যায় পঙ্গপালের এক বিরাট ঝাঁক। বিজ্ঞানীদের মতে এত বড় পঙ্গপালের ঝাঁক এর আগে আর কখনো দেখা যায়নি। ঝাঁকটি ছিল প্রায় চারশ' বর্গমাইল এলাকা জুড়ে। আর সেই ঝাঁকে পঙ্গপালের সংখ্যা ছিল চল্লিশ কোটির মত। ইথিওপিয়ায় তখন চলছিল খরা। মাঠে এমনিতেই তেমন ফসল ছিল না। যেটুকু বা ছিল, তার প্রায় সবটাই কয়েক দিনের মধ্যে খেয়ে শেষ করে দিল সেই পঙ্গপালের দল। ফলে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষে পড়ল সারা ইথিওপিয়ার মানুষ। বলতে কি, 1978 সালে একটুর জন্য বেঁচে যায় পাকিস্তান ও ভারতও। ওই বছর আরব সাগরের পথে ভেসে আসছিল একটি জাহাজ। হঠাৎ সেই জাহাজের ক্যাপটেনের চোখে পড়ল এক খণ্ড মেঘ। সেটা যে আসল মেঘ নয়, পঙ্গপালের একটি ঝাঁক, মুহূর্তেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি খবর পাঠান পাকিস্তান এবং ভারত সরকারকে : একদল পঙ্গপাল আপনাদের দেশের দিকে উড়ে যাচ্ছে। সৌভাগ্য, খবরটি আগে থেকে পাওয়া গিয়েছিল তাই রক্ষে। ভারত এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রপুঞ্জের

পঙ্গপালের ঝাঁক

সাহায্যে মাঝপথেই বিমান থেকে কীটনাশক ওষুধ ছড়িয়ে পঙ্গপালের দলটি ধ্বংস করে। যদি তা করা না যেত পাকিস্তান এবং ভারতের পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং রাজস্থানের চাষীরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হত।

সত্যি কথা বলতে কি, ব্যাপারটা তোমাদের কাছে হয়ত গল্পের মত মনে হবে, কিন্তু চাষীদের কাছে পঙ্গপাল জীবন্ত বিভীষিকার মত। পঙ্গপালের নাম শুনলে তাদের বুকের রক্ত ভয়ে শুকিয়ে যায়। বিচিত্র এই পতঙ্গ। ইংরেজিতে এদের বলা হয় 'লোকাস্ট্'। বাংলায় বলা হয় এক শ্রেণীর ফড়িং। চেহারা উচ্চিংড়ের মত। শিশু বয়সে এরা ঘাস এবং লতাপাতার উপর লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। বয়েস বাড়লে দলবদ্ধ ভাবে উড়তে শেখে। যখন তারা দলবদ্ধ হয় তখনই তাদের বলা হয় পঙ্গপাল। দলবদ্ধ অবস্থায় ফসলের উপর যখন ঝাঁপিয়ে পড়ে, বুঝতে হবে, সব শেষ। দেখতে দেখতে জমির ফসল সাবাড়। একটি পঙ্গপাল দৈনিক তার দেহের সমপরিমাণ ওজন খাবার খেতে পারে। এই মত হিসেব কষলে 1979 সালে ইথিওপিয়ায় যে পঙ্গপালের ঝাঁকটি পড়েছিল, তারা ফসল সাবাড় করেছিল দৈনিক 80000 টনের মত। যা চার লক্ষ মানুষের এক বছরের খাবার।

দপ্তর থেকে

বছর দশ আগে ইংলণ্ডের কীটবিজ্ঞানী ক্রিস্টোফার এফ. হেমিং পঙ্গপালের উপর গবেষণা চালান। তিনি দেখেছেন, বিশেষ এক শ্রেণীর পঙ্গপালের জন্মস্থল মরুভূমি। জন্মের পর তারা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় উড়ে গিয়ে সেখানে ডিম পাড়ে। সেই ডিম থেকে যাদের জন্ম, তারা উড়ে গিয়ে অন্যত্র ডিম পাড়ে। আর এইভাবে তারা ছড়িয়ে পড়ে এক হাজার থেকে তিন হাজার মাইল দূরত্ব পর্যন্ত। দেখা গেছে, বিচিত্র এই পতঙ্গ এক নাগাড়ে সতের ঘণ্টা উড়তে পারে। তবে সেটা নির্ভর করে আবহাওয়ার তাপমাত্রার উপর। আকাশে রোদ থাকলে এই তাপমাত্রা 60 ডিগ্রি ফারেনহাইটের উপরে হলে ভাল। মেঘলা আকাশে 75 ডিগ্রি ফারেনহাইট। হেমিং লক্ষ্য করেছেন, মরু অঞ্চলের একদল পঙ্গপাল 1954 সালে সুদূর ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ থেকে গ্রেট ব্রিটেন পর্যন্ত উড়ে গিয়েছিল। উভয় অঞ্চলের দূরত্ব 1600 মাইল।

পঙ্গপাল নিয়ে গবেষণা চলছে একশ' বছরের মত। 1921 সালে গবেষণা করতে গিয়ে বিখ্যাত পতঙ্গ-বিজ্ঞানী স্যার বোরিস উভারোভ আবিষ্কার করেন মজার একটি ঘটনা। তিনি লক্ষ্য করেন, একই রকম পতঙ্গ—পঙ্গপালও গ্র্যাসহপার। পঙ্গপাল দলবদ্ধভাবে স্থান থেকে স্থানান্তরে উড়ে যায়। গ্র্যাসহপাররা একই জায়গায় বাস করে। উভারোভের প্রথমে ধারণা হয়েছিল পঙ্গপাল এবং গ্র্যাসহপার সম্ভবত দুটি পৃথক শ্রেণীর প্রাণী। কিন্তু পরে দেখলেন, তাদের আচরণ একই রকম। যতক্ষণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় মাটির বুকে বাস করে, ততক্ষণ গ্র্যাসহপার। কিন্তু যেই দলবদ্ধ হল, তখন তারাই হয়ে গেল পঙ্গপাল।

বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, এক-একটি স্ত্রী-পঙ্গপাল 120টির মত ডিম পাড়ে। এক নাগাড়ে যে ডিম পাড়ে তাও নয়। প্রতি সাত থেকে দশ দিন অন্তর ক্ষেপে ক্ষেপে ডিম পাড়ে। এমনও দেখা গেছে কোন কোন স্ত্রী-পঙ্গপাল চার থেকে ছয় মাসে ডিম পেড়েছে 200-র মত। তারপর সে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে। পরিবেশ এবং আবহাওয়া অনুযায়ী ডিম ফুটে যখন বাচ্চা হয়, তখন তাদের গায়ের রঙ পাল্টায়। কখনো ধূসর, পাখা এবং গলার কাছে কালো কালো ডোরা কাটা। কখনো বা ফিকে হলদে। ডিম থেকে বেরিয়ে আসার পর শুরু হয় রাক্ষুসে চালচলন। গিলতে থাকে লতা-পাতা। তারপর হঠাৎ দলবদ্ধভাবে তারা বাতাসে ভর করে উড়তে থাকে। কখন তারা উড়বে, কোথায় তারা যাবে—বিজ্ঞানীদের কাছে এ সব ব্যাপার এখনো ধাঁধার মতই থেকে গেছে। তবে ইদানীং বিমান এবং কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে নিয়মিত নজর রাখা হচ্ছে। বাতাসে পঙ্গপালের মেঘ দেখা গেলে কীটনাশক ওষুধ ছড়িয়ে আকাশেই যাতে তাদের ধ্বংস করা যায় তারও ব্যবস্থা হয়েছে। এই ব্যবস্থার দরুনই পঙ্গপালের আক্রমণ এখন কমে এসেছে অনেক।

কেন্দ্রীয় সড়ক গবেষণা

বিমাণ বসু

এক বন্ধু কিছুদিন আগে বিদেশ ভ্রমণে গিয়েছিল। তার কাছে জানতে পারলাম যে সে সব দেশের রাস্তায় গাড়ি ঘণ্টায় 120-130 কিলোমিটার বেগে অনায়াসে ছুটে চলে, অথচ গাড়িতে বসে তা বুঝতেই পারা যায় না। কারণটা অবশ্য আর কিছুই নয়, ভাল পাকা রাস্তা। সুন্দর, মসৃণ সেসব রাস্তা কোথাও এবড়ো খেবড়ো নয়, তাতে জায়গায় জায়গায় ফাটল বা গর্ত নেই। সে তুলনায় আমাদের দেশের বেশির ভাগ রাস্তাই দ্রুতবেগে গাড়ি চলার অনুপযুক্ত। সে সব রাস্তায় ঘণ্টায় মাত্র 50-60 কিলোমিটার বেগে গাড়ি চালানোই দুষ্কর। প্রচণ্ড ঝাঁকুনির চোটে হাড়গোড় ভেঙে যাওয়ার উপক্রম। আর গ্রামাঞ্চলের রাস্তার তো কথাই নেই। কাঁচামাটি বা সুরকি দিয়ে তৈরি সেসব রাস্তা কেবলমাত্র গরুর গাড়ি চলারই উপযুক্ত। অথচ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য ভাল, পাকা রাস্তার খুবই প্রয়োজন, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে যেখানে রেল বা বিমান সেবা পৌঁছনো সম্ভব নয়।

ভারতের মত বিশাল দেশে সড়ক নির্মাণের সমস্যা অনেক। যেমন ধরো, মাটির ধরন সব জায়গায় একরকম নয়। কোথাও মাটি নরম কোথাও বা মাটিতে বালির পরিমাণ খুব বেশি। এসব ছাড়াও সমস্যা রয়েছে রাস্তা তৈরির উপকরণ নিয়ে। সব জায়গায় রাস্তা নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় পাথর, কাঁকর সুরকি ইত্যাদি পাওয়া যায় না। এসব আনতে হয় অন্য জায়গা থেকে, ফলে খরচ পড়ে অনেক। পাহাড়ী এলাকায় আবার সমস্যা অন্য ধরনের। এসব জায়গায় ধস নামার সম্ভাবনা বেশি তাই তারজন্য বিশেষ প্রতিরোধ ব্যবস্থার প্রয়োজন ! এই সব নানা সমস্যার সুরাহার জন্য এবং তা নিয়ে গবেষণার উদ্দেশ্য নিয়েই 1952 সালে নতুন দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সড়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা 'সি আর আর আই' এর স্থাপনা করা হয়। সড়ক নির্মাণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় ছাড়াও, দেশের বড় শহরগুলির জন্য সুষ্ঠু যানবাহন ব্যবস্থা এবং সড়ক নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয় নিয়েও এখানে গবেষণা চালানো হয়।

'সি আর আর আই' এ গবেষণার এক প্রধান বিষয় হলো স্থানীয় মাল মশলা ব্যবহার করে কম খরচে পাকা রাস্তা তৈরির পদ্ধতির বিকাশ। এখানকার বিজ্ঞানীরা রাস্তা তৈরির জন্য নিকৃষ্ট মানের কাঁকর, ল্যাটেরাইট পাথর ইত্যাদির বিজ্ঞান সম্মত ব্যবহার চালু করেছেন যাতে খরচ অনেক কমেছে। মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র প্রদেশ ও দক্ষিণের অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যে রাস্তা তৈরির একটা বড় বড় সমস্যা ছিল সেখানে নরম কাল মাটি যার ওপর পাকা সড়ক নির্মাণ প্রায় দুঃসাধ্য। অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর এ সমস্যার সমাধান 'সি আর আর আই' এর বিজ্ঞানীরা বের করেছেন। তাঁরা ঐ কালোমাটির সঙ্গে চুণ মিশিয়ে তাকে পাকা সড়ক নির্মাণের উপযুক্ত করে নিতে সক্ষম হয়েছেন। এর ফলে শুধু যে কেবল খরচই কমেছে তা নয়, অন্যান্য কাজে আসে এমন বহু মাল মশলার অপচয় বন্ধ করাও সম্ভব হয়েছে।

রাস্তা তৈরির মাল মশলা, যেমন কাঁকর, সুরকি ইত্যাদি সাধারণত মাটি খুঁড়েই পাওয়া যায়। কিন্তু মাটির নিচে এসবের ভাণ্ডার খুঁজে বের করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সাধারণত বিক্ষিপ্ত বেশ কয়েকটি স্থানে খনন করেই এ কাজ করা হয়। কিন্তু তাতে যে শুধু সময়ই বেশি লাগে তা নয় খরচও হয় প্রচুর। এ সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে 'সি আর আর আই' এর বিজ্ঞানীরা বিমান থেকে তোলা ছবির বিশ্লেষণ করে মাটির নিচে ঐ সব ভাণ্ডার খুঁজে বের করার এক অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন যাতে সময় লাগে অল্প এবং খরচও হয় অনেক কম।

পাকা সড়ক নির্মাণের এক বহুল প্রচলিত পদ্ধতি হলো আর সি সি, বা সিমেণ্ট রিএনফোর্সড্ কংক্রীটের ব্যবহার। এই পদ্ধতিতে মাটিতে লোহার সিকের কাঠামো পেতে তার ওপর কুচি পাথর ও সিমেণ্টের মিশ্রণ ঢেলে রাস্তা তৈরি করা হয়। কংক্রীট জমাট বাঁধার পর এ রাস্তা হয় অসম্ভব মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী। সাধারণ পীচের রাস্তার মত এতে বছর বছর মেরামত বা নতুন পীচ ঢালার প্রয়োজন হয় না।

সাধারণত কংক্রীটের রাস্তা তৈরির সময় আংশিক ভাবে ঢালাই করা হয়। প্রথমে কিছুটা অংশ ফাঁক রেখে বাকি অংশগুলি ঢালাই করা হয়। পরে ঐ ফাঁকগুলো ঢালাই করে ভরে দেওয়া হয়। দেখা গেছে এভাবে ঢালাই করা কংক্রীটের রাস্তা পুরোটা এক রকম হয় না। মিশ্রণের তারতম্য ও অন্যান্য কারণে রাস্তায় অসমতলতা দেখা দেয়। 'সি আর আর আই' এর বিজ্ঞানীরা অবিচ্ছিন্নভাবে কংক্রীট ঢালাই করে সড়ক নির্মাণের এক নতুন পদ্ধতি বের করেছেন যাতে করে আরও উন্নত মানের কংক্রীটের সড়ক নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে। দিল্লী ও আগ্রার মধ্যবর্তী রাজপথের বেশ কিছুটা অংশ ঐ নতুন পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়েছে যা আজ প্রায় 20 বছর পরেও অটুট অবস্থায় রয়েছে।

সড়ক নির্মাণে সিমেণ্টের খরচ কমানোর জন্য 'সি আর আর আই'এর বিজ্ঞানীরা এক ধরনের পোড়া মাটির

'পোসালানা' (Puzzolana) তৈরি করেছেন যার সঙ্গে চুণ মিশিয়ে সিমেন্টের মতই ব্যবহার করা যায়। রাস্তা তৈরির বিটুমেন বা পীচের প্রয়োগ নিয়ে গবেষণা চালিয়ে এখানকার বিজ্ঞানীরা বিশেষ ধরনের বাইণ্ডার বা বন্ধক দ্রব্য তৈরি করেছেন যা সড়কের ওপরের আস্তরণে কুচি পাথর বা কাঁকর খুব মজবুত করে বেঁধে রাখতে পারে। প্রচণ্ড গরমে বা বৃষ্টির জলে অথবা ভারি যানবাহন চলাচলের ফলে এ রাস্তা সহজে নষ্ট হয় না, ফলে মেরামতের খরচও হয় অনেক কম।

পাহাড়ী অঞ্চলে সড়ক নির্মাণের এক বড় সমস্যা হলো ধস। যে সব জায়গায় ধস নামার সম্ভাবনা বেশি সেই জায়গায় নিরাপদে সড়ক নির্মাণের জন্য যে সব সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন তা নিয়ে 'সি আর আর আই-'এর বিজ্ঞানীরা বিশেষ পরীক্ষা চালিয়েছেন। তাঁদের পরীক্ষার ফলে প্রাপ্ত তথ্যাদি সড়ক নির্মাতাদের ব্যবহারের জন্য একটি পুস্তকের আকারে প্রকাশিত হয়েছে। ঐ পুস্তকে শুধু যে ধস প্রতিরোধের উপায় দেওয়া আছে তা নয়। কোথাও ধস নামার ফলে সড়কের ক্ষতি হলে তা কি ভাবে সহজে মেরামত করা যায় তাও এতে বলা বলা হয়েছে।

সড়ক নির্মাণের উন্নত পদ্ধতির বিকাশ ছাড়াও আরও একটা বিষয় নিয়ে 'সি আর আর আই 'এ গবেষণা চালানো হয়। তা হলো সড়কের গুণাগুণ পরীক্ষা করে দেখার যন্ত্রপাতি। ধরো, একটা পাকা সড়ক তৈরি হয়েছে। সেটা কি সত্যিই দ্রুতবেগে যানবাহন চলাচলের পক্ষে যথেষ্ট মসৃণ? আর তা যদি না হয় তবে সড়কের কোন কোন অংশ মসৃণ নয়? এ সব পরীক্ষা করার জন্য 'সি আর আর আই 'এর বিজ্ঞানীরা বিশেষ ধরনের কয়েকটি যন্ত্র তৈরি করেছেন। এদের মধ্যে রয়েছে রাস্তার অসমতলতা নির্দেশক ও রেকর্ডার এবং প্রফাইলোগ্রাফ যন্ত্র। এ যন্ত্রগুলির ব্যবসায়ীক উৎপাদন শুরু হয়ে গেছে।

সড়কের বিষয় কিছু বলতে গেলে যানবাহনকে বাদ দেওয়া যায় না। যেমন ধরো শুধু যে পাকা সড়ক হলেই যানবাহন নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারবে তা নয়। তা নির্ভর করবে কি ধরনের যানবাহন চলবে তার ওপর। যদি একই রাস্তায় দ্রুতগামী মোটর গাড়ি, ট্রাক, বাস ও টেম্পো'র সঙ্গে সাইকেল এবং ঘোড়ার গাড়িও চলে তাহলে বুঝতেই পারছো কি হবে। যদি নিয়ন্ত্রণ না করা হয় তাহলে এ ধরনের মিশ্রণ কেবলই ট্র্যাফিক জ্যাম সৃষ্টি করবে। দেশের বড় শহরগুলিতে আজ এ ধরনের সমস্যা প্রায়ই দেখা যায়। এ বিষয় নিয়েও 'সি আর আর আই 'এ গবেষণা চালানো

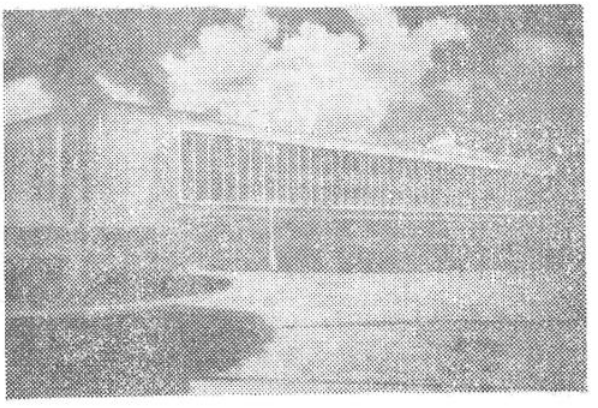

কেন্দ্রীয় সড়ক গবেষণাগার

হয়েছে। গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে নতুন দিল্লী সমেত বেশ কয়েকটি শহরের যানবহন প্রণালীর সংস্কার সম্ভব হয়েছে। নতুন ধরনের ট্র্যাফিক সিগন্যালিং চালু করা হয়েছে, যার ফলে রাস্তায় ট্র্যাফিক জ্যাম অনেক কমেছে। সড়ক দুর্ঘটনার হারও অনেক ক্ষেত্রে হ্রাস পেয়েছে।

বেসামরিক গবেষণা ছাড়া সামরিক গুতরুর কয়েকটি বিষয় নিয়েও 'সি আর আর আই 'এ গবেষণা চালানো হয়। এর মধ্যে রয়েছে সীমান্তবর্তী এলাকায় খুব অল্প সময়ের মধ্যে পাকা সড়ক নির্মাণ এবং যুদ্ধের সময় বোমা আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক ও রানওয়ে মেরামত ইত্যাদি। যুদ্ধের সময় আপাতকালীন অবস্থায় বিমান অবতরনের জন্য বহনযোগ্য ল্যাণ্ডিং স্ট্রিপও এখানকার বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছেন। ঐ ল্যাণ্ডিং স্ট্রিপের ওপর সহজেই ছোট ছোট ফাইটার জেট ইত্যাদি নামতে পারে। এছাড়া, অল্প সময়ের মধ্যে খাল নালা ইত্যাদির ওপর সেতু তৈরি করার পদ্ধতিরও বিকাশ সম্ভব হয়েছে।

এতক্ষণ তোমাদের গবেষণার বিষয় নিয়ে বললাম। কিন্তু সি আর আর আই-এ শুধু গবেষণাই চালানো হয় না, এখানে সড়ক নির্মাণ সংক্রান্ত নানা বিষয় নিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও আছে। প্রতি বছর এখানে ছ'টি ট্রেনিং কোর্স চালানো হয় যাতে দেশের বিভিন্ন সংস্থা থেকে সড়ক নির্মাণের কাজেরত প্রশিক্ষার্থীরা যোগদান করেন। এছাড়া কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সড়ক নির্মাণ বিভাগগুলিকেও এ সংস্থার বিজ্ঞানীরা নিয়মিত পরামর্শ প্রদান করেন।

---

7 ইউ এফ্ কলেজ রোড, নিউদিল্লী-1

কথা বলা পাখি চন্দনা

সুধীন সেনগুপ্ত

আনন্দ বিনোদনের জন্য যে সব পাখি আমরা রাখি তার মধ্যে চন্দনা অন্যতম। ইংরেজি নাম Large Indian Parakeet, বৈজ্ঞানিক নাম Pstjcula eupatria nipalensis (Hodgson)। মানুষের কথা অনুকরণ করার দক্ষতার জন্যই চন্দনার এত কদর। তাছাড়া ঠিক মতো শিক্ষা দিলে এরা অনেক চাতুরি শিখে নিয়ে তা দেখাতে পারে। যেমন, খেলনা পিস্তলে গুলি ভরা ও নিক্ষেপ করার কাজ চন্দনা অতি সহজেই শিখে নেয়। যাই হোক, বন্য অবস্থায় এই পাখি কথা অনুকরণ করতে পারে না, মানুষের কাছে শিখেই তারা এই ক্ষমতার অধিকারী হয়। এদের স্বরযন্ত্র বেশ সুগঠিত এবং মাংসল। জিভ-এর সাহায্যে মুখগহ্বরের আয়তন পরিবর্তন করেই চন্দনা কথা বা ডাক অনুকরণ করে থাকে।

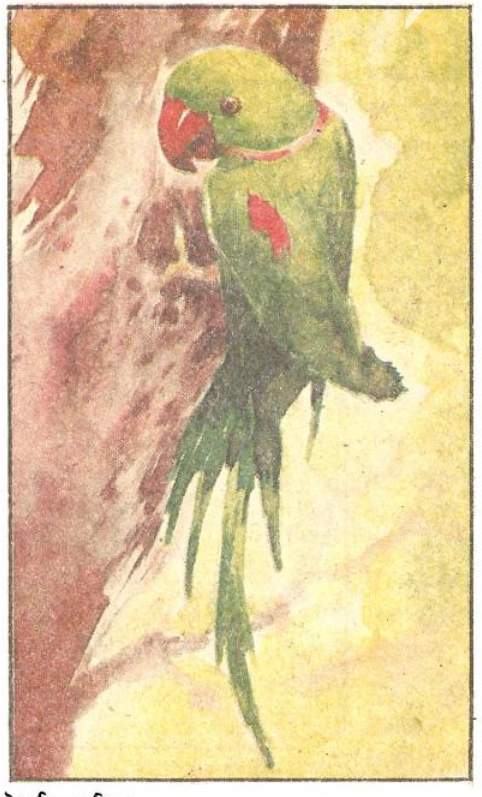

হিমালয়ের পাদদেশ থেকে আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের অনেক জায়গায় চন্দনা পাওয়া যায়। প্রায় দশ ইঞ্চি লম্বা সবুজ রঙ-এ ঢাকা নয়াভিরাম চন্দনার দৃঢ় বাঁকানো রক্তবর্ণ চঞ্চু, লাল ও কালো রঙ-এর গলার ও কাঁধের মেরুন রঙ-এর ছাপ দেখে এদের অতি সহজেই চেনা যায়। তবে মেয়ে চন্দনার গলার কলার থাকে না।

গাছ-গাছড়ায় ভরা জায়গা, শস্যক্ষেত্র ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ও ফলের বাগান চন্দনার বসবাসের উপযুক্ত পরিবেশ। খাদ্যের খোঁজে ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে এরা বাসস্থানের সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়। খাদ্যের অভাব ঘটলে বা অন্যত্র প্রচুর খাদ্যের সন্ধান পেলে এরা দূরান্তেও পাড়ি দেয়। অন্যান্য শস্যের মধ্যে জওয়ার ও ভুট্টা এদের প্রিয় খাদ্য। তবে ধান, যব, গম প্রভৃতি শস্যও চন্দনা প্রচুর পরিমাণে খায়। অন্যদিকে বাগানের ফল খাওয়ায় এদের জুড়ি নেই। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে এদের খাদ্য তালিকার 52% শস্য, 19% বাগানের ফল এবং বাকি অংশ বন্য ফল-মূল। কাজেই চন্দনার রূপ-গুণ আমাদের মুগ্ধ করলেও এরা ভারতের অন্যতম প্রধান শস্য অনিষ্টকারি পাখি।

শীতের আরম্ভে চন্দনা জুটি বাঁধে। দয়িতার মনোরঞ্জনের জন্য পুরুষ পাখি যে সব কলা-কৌশল দেখায় তার অনন্যতায় মানুষ হতবাক হয়ে পড়ে। কখনো পুরুষটি আগ্রহের সঙ্গে তার উদ্গীরণ করা খাদ্য দয়িতার মুখে ঢেলে দেয়, কখনও বা দীর্ঘ সময় ধরে উভয়ে চঞ্চুর বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। হঠাৎ পুরুষ পাখিটি একটু সরে গিয়ে ঘাড় পেছনে বেঁকিয়ে প্রেমিকাকে দেখার চেষ্টা করে। আবার কখনও সে একটা পা ও ডানা স্ত্রীর দিকে প্রসারিত করে নানা রকম শব্দ করতে থাকে। পর মুহূর্তে অন্য পাশে সরে গিয়ে পুরুষ চন্দনা একই কলা-কৌশল প্রদর্শন করে। এইভাবে পূর্বরাগের তীব্রতা যখন চরমে পৌঁছায় তখন নীড় তৈরির জন্য নারকেল, শিমুল, সিসু এবং সুন্দরবন অঞ্চলে কেওড়া ও সুন্দরী গাছ বেছে নেয়। উভয়ের চেষ্টায় দুই-এক দিনের মধ্যে গাছের কাণ্ডে একটি 3-4 সে. মি. গভীর গর্ত তৈরি হয়। এর দু-একদিন পরে স্ত্রী চন্দনা 2-8 সাদা রঙ-এর ডিম উপহার দেয়। পিতা-মাতা উভয়ে আর্দ্রতা ও উষ্ণতা রক্ষা করে। প্রায় 20-21 দিন পরে নীড়ে শাবক চন্দনার স্পন্দন শোনা যায়। পিতা-মাতার উদ্গীরণ করা খাদ্য খেয়ে এরা দ্রুত বড়ো হতে থাকে। জন্মের পর 15-20 দিন পরে নবীন চন্দনার দল প্রবীনদের পরিত্যাগ করে শ্যামল বনানীর কোলে স্থান করে নেয়।

[ছবি এঁকেছেন : অলয় ঘোষাল]

লতানে ফুল ক্লিরোডেনড্রন

এণাক্ষী বিশ্বাস

এখন যে ফুলটির সম্বন্ধে বলব সেই লতানে ফুলগাছটির কেতাবী নাম ক্লিরোডেনড্রন থমসোনে। এর আদি বাসস্থান আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল। ভারবিনেসী গোত্রের অর্থাৎ বেটুজাতীয় ফুলের অন্তর্গত।

এই ফুলটির প্রজাতির নামকরণের একটি ছোট ইতিহাস আছে। 1861 সালের কথা রেভারেণ্ড ডব্লু. সি. থমসন, ধর্মপ্রচারের জন্য আফ্রিকা সফরে যান। ধর্ম প্রচারের সময় আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে এই সাদা বৃতি পরিবেষ্টিত টকটকে লাল পাঁপড়িযুক্ত ফুল দেখে মুগ্ধ হন। অতঃপর এই ফুলগাছটি ইংল্যাণ্ডে এনে চাষ করেন। পরবর্তীকালে তাঁর স্ত্রীর সম্মানার্থে এই ফুল গাছটির প্রজাতির নামকরণ হয় থমসোনে।

বর্ষার সময় এই লতানে গুল্ম জাতীয় গাছটি ফুলে ফুলে ভরে ওঠে। পুষ্প-বিন্যাস নিয়ত, সবৃন্তক, বৃন্ত প্রায় 1·5 থেকে 2 5 ইঞ্চি লম্বা হয়। এ ক টি ছোট পা তা র কক্ষে ফুল বা ম ঞ্জ রী দ ণ্ড জন্মে। এই ছোট পাতাকে মঞ্জরী-পত্র বা পুষ্পধর-পত্রের আকৃতি ফলকাকার ও রো ম শ হ য়। ট ক ট কে লাল রঙের পাঁচটি পাঁপড়িযুক্ত ও সাদা রঙের বৃতি পরিবেষ্টিত হয়। বৃতিগুলি অপেক্ষাকৃত বড় হয়। বৃত্যাংশ প্রায় 0·75 থেকে 1·25 ইঞ্চি লম্বা এবং 0·4 থেকে 1 ইঞ্চি চওড়া হয়। দলমণ্ডলের নিচের অংশ নলাকৃতি হয় ও উপরের অংশ পাঁচটি পাঁপড়িতে বিভক্ত হয়। পুংদণ্ড খুব লম্বা ও সংখ্যায় চার থাকে। গর্ভদণ্ড ও পুংদণ্ডের মত লম্বা হয়।

বর্ষাকালে এই লতানে ফুল গাছটির বড় বড় বৃতির মধ্যে টকটকে লাল ফুলের সৌন্দর্য সহজেই সকলের দৃষ্টি কেড়ে নেয়।

বিশেষতঃ এই ফুলগাছটির বৃদ্ধি বীজ, কাটিং দ্বারা হয়।

বৃটিশ নৌশক্তির শ্রেষ্ঠত্বের রহস্য

ডাঃ অরুণকুমার দত্ত

সমুদ্রভ্রমণ আধুনিক কালে মামুলি ব্যাপার। কিন্তু একদিন দুরারোগ্য স্কার্ভিরোগ কি ভাবে সমুদ্র অভিযাত্রীদের পর্যুদস্ত করত ও তার সমাধান কি ভাবে হল সে কাহিনী এখানে বলছি।

ভারত-মহাসাগরের নীল সমুদ্রের ওপর দিয়ে কয়েকটা জাহাজ পাল তুলে চলছিল। ডেকের ওপর জাহাজের ক্যাপটেন দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টি—উত্তর পূর্বদিকে নিবদ্ধ। আজানুলম্বিত বাহু পর্তুগীজ ক্যাপটেনের সারামুখ অযত্নে বর্দ্ধিত দাড়ি গোঁফে ভরে গেছে। চোখে তার উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি।

সেই ক্যাপটেনের নাম ভাস্কোডাগামা। 1597 সালে ভাস্কোডাগামা জাহাজে করে মাত্র 160 জন বেপরোয়া দুর্ধর্ষ নাবিকদের নিয়ে পর্তুগাল থেকে ভারতের অভিমুখে পাড়ি দেন।

1453 সালে তুর্কীরা কনষ্ট্যানটিনোপোল দখল করার পর স্থলপথে ভারতের সঙ্গে ইউরোপীয়দের যোগাযোগের পথ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ব্যবসা বাণিজ্য সব বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ইউরোপীয়রা দিশেহারা হয়ে জলপথে ভারতের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করার চেষ্টা করছিলেন। ভারতের অপরিমেয় ঐশ্বর্য ধন দৌলতের কথা তখন কিম্বদন্তীতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কলম্বাস সেই সোনার ভারত খুঁজতে গিয়ে আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করেছিলেন। যদিও তার জীবদ্দশায় তিনি তা জানতে পারেননি। তারপর থেকে ইউরোপীয়রা বার বার চেষ্টা করেছেন, কি ভাবে, কোনদিক দিয়ে গেলে ইস্টইণ্ডিজে পৌঁছান যায়। অবশেষে ভাস্কোডাগামার নেতৃত্বে একদল নাবিক আটল্যাণ্টিক পার হয়ে আফ্রিকা ঘুরে ভারত-মহাসাগরে পড়েছিলেন। ঝড়ে তার জাহাজ বিপর্যস্ত হয়ে যায়। অবশেষে উত্তমাশা অন্তরীপে পৌঁছে তাঁর দলবল সে যাত্রায় বেঁচে যান। শুধু কি তাই তখনকার দিনে সমুদ্রের ওপর বেশ কিছুদিন ধরে থাকলেই একধরনের রোগে নাবিকরা আক্রান্ত হয়ে পড়ত। এই স্কার্ভি রোগে ভাস্কোডাগামার দলে 160 জনের মধ্যে 100 জনই মারা গিয়েছিলেন। হঠাৎ অনেক দূরে নীলাম্বুর মাঝখানে সবুজের রেখা দেখতে পেয়ে ভাস্কোডাগামা আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন। ধীরে ধীরে সবুজ নারকেল বীথি ঘেরা তটভূমি স্পষ্টতর 1497 সালে মালাবারের কালিকটে পৌঁছে জলপথে প্রথম ইউরোপীয় অভিযাত্রী ভাস্কোডাগামার নেতৃত্বে এক নৌ ঘাঁটি স্থাপিত হয়। তারপর কিভাবে একদিন বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড রূপে দেখা দিয়েছিল সে ইতিহাস কারুর অজানা নয়।

ভাস্কোডাগামার জাহাজে নাবিকরা যে দুরারোগ্য স্কার্ভি রোগে মারা গিয়েছিলেন, তা তখন নাবিকদের মধ্যে খুবই ব্যাপক ছিল। কারণ জানা না থাকায় এর চিকিৎসা ছিলনা। নাবিকরা একে সমুদ্রের রাক্ষসী রোগ বলতেন। আসলে ভিটামিন 'সি' বা এ্যাসকরবিক এ্যাসিডের অভাবে এই রোগ দেখা দিত। কাঁচা শাকসব্জি, ফলমূল বিশেষ করে আনারস. কমলালেবুতে ভিটামিন 'সি' প্রচুর আছে। দীর্ঘকাল সমুদ্রে থাকার ফলে, নাবিকেরা এইখাদ্য থেকে বঞ্চিত থাকার ফলে, নাবিকেরা শরীরে ভিটামিন 'সি'র অভাব প্রকট হত। প্রথমে মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়া, পরে মাড়ি ফুলে দুই দাঁতের মাঝখান দিয়ে ঝুলে পড়া এবং হাতের ও পায়ের চামড়ার নীচে রক্ত-স্ফোটক দেখা দিত। পরে ক্ষুধামান্দ্য অবশভাব, শেষকালে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াকলাপ স্তব্ধ হয়ে যেত।

গ্রীক ও রোমানরা যখন সভ্যতার শীর্ষে তখনও তারা কিন্তু এই রোগের কারণ ধরতে পারেননি কানাডা অভিযান কালে অনেক অভিযাত্রী স্কার্ভি'র কবলে পড়ে মারা যান। মজার কথা আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা কিন্তু জানতেন টাটকা শাকসব্জী ও ফলমূল খেলে এ ধরণের রোগ হয় না, কিন্তু ভাষাগত আদান প্রদান না থাকায় ও ভাবগত-বৈষম্যের জন্য তাদের এই জ্ঞান তখন সভ্য মানুষের কাছে পৌঁছায়নি। ষোড়শ শতাব্দীর অভিযানগুলোয় রাশিয়ান ও সুইডিশরা আনারসের রস ব্যবহার করতেন। তাঁরা দেখেছিলেন এই ফলের রস খেলে স্কার্ভি রোগ হয় না; কিন্তু কেন হয় না সে কারণ তাঁরা জানতেন না। কৌতূহলের বিষয় এই রাশিয়ানরাই 1943 সালে, তাঁদের গবেষণাগারে প্রথম পরীক্ষা করে দেখালেন আনারসের ভেতর প্রচুর পরিমান ভিটামিন 'সি' আছে যা স্কার্ভি রোগ প্রতিরোধ করে।

ডাঃ লিণ্ড নামে এক বৃটিশ নৌ শল্য-চিকিৎসকের চোখে প্রথম এই রোগের রহস্য ধরা পরে। বৃটিশরা তখন বার বার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাঁদের অভিযান চালাচ্ছেন আর এই রাক্ষুসে সামুদ্রিক রোগের কবলে পড়ে তাঁদের নাবিকরা নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। স্কটিশ ডাঃ লিণ্ড লক্ষ্য করলেন নাবিকরা যখন মাঝ সমুদ্রে বেশ কিছুদিন ভেসে বেড়ায়, তখনই এ রোগের লক্ষণগুলো আত্মপ্রকাশ করে। আবার তটভূমিতে ফিরে এসেই রোগের উপসর্গগুলো মিলিয়ে যায় কেন এমন হয়?—ডাঃ লিণ্ড ভাবতে বসলেন। তাহলে কি এদের খাদ্যের সঙ্গে রোগের সরাসরি কোনো সম্বন্ধ আছে? তখন রেফ্রিজারেটার ছিলনা। খাবার বেশীদিন টাটকা রাখা যেতনা। ডাঃ লিণ্ড কমলালেবু, লেবুজাতীয় ফলগুলো রোগীদের খেতে দিয়ে দেখলেন তাদের স্কার্ভি হচ্ছেনা। তিনি বুঝলেন, টাটকা ফলমূল, শাকসব্জির ভেতর এমন কিছু পদার্থ আছে, যা এই রোগ ঠেকিয়ে রাখতে পারে। এই রোগের বিজ্ঞানভিত্তিক বিবরণ ও প্রতিরোধের কথা ডাঃ লিণ্ডই 1753 সালে প্রথম লিপিবদ্ধ করেন।

1772-75 সালে দীর্ঘ সমুদ্র অভিযানকালে ক্যাপটেন কুক, লিণ্ডের পরামর্শ মত তাঁর নাবিকদের মাঝ সমুদ্রে ফলের রস খেতে দিতেন আবার যখনই তটভূমির দেখা পেতেন তখনই নাবিকদের টাটকা শাকসব্জি, ফলমূল খাওয়াতেন। এই অভিযানকালে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড আবিষ্কৃত হয়েছিল। তাঁর নাবিকদের কারো স্কার্ভি রোগ হয়নি। আন্দামানের কোকোস্ দ্বীপ ক্যাপটেন কুকের এই অভিযানকালে আবিষ্কৃত হয়ে তার নাম অনুযায়ী রাখা হয়। এরপর বৃটিশ রাজশক্তি বাধ্যতামূলক ভাবে তাদের নাবিকদের মধ্যে সমুদ্র যাত্রাকালে তাজা ফলমূল খাওয়া চালু করলেন। বৃটিশ নাবিকরা যার ফলে স্কার্ভি রোগে ভুগতেন না। পরিণামে তারা নৌ যুদ্ধে অজেয় শক্তিরূপে পরিগণিত হলেন। অথচ অন্যান্য দেশের নাবিকরা স্কার্ভি রোগের কারণ জানতো না বলে মাঝ সমুদ্রে এই রোগে হীনবল হয়ে পড়তেন ও বৃটিশ নৌ-সেনার সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হতেন। এই ভাবে বৃটিশ নৌশক্তি একদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

149, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলকাতা-26।

বুদ্ধি নিয়ে খেলা পার্থসারথি চক্রবর্তী

এক. দুনিয়া সফরের মজা

জাহাজ অথবা উড়োজাহাজ যাতে করেই তুমি যাও না কেন—Tourania সফর করতে তোমার কোনও ঝামেলাই নেই। Tourania কি তা ভাবছ বুঝি? Tourania হচ্ছে একটা বিশাল ভূখণ্ড যার মধ্যে রয়েছে 13টি দেশ এদের প্রত্যেকের ইংরাজী আদ্যক্ষর দিয়ে চেনা যাবে। E-থেকে সফর শুরু করে দাও, তীর চিহ্ন বরাবর এগিয়ে যাবে, দেখবে কেমন মজা—গোটা দুনিয়াটাই অর্থাৎ E-A-R-T-H সফর করা হয়ে গেছে তোমার!

আরও মজা, এই সফরের সময় তোমার অন্তত 20টা দেশ দেখা হয়ে যাবে। কোনও পাশপোর্টের ঝামেলা নেই এই সফরে, শুধু একটা দেশ থেকে অন্য দেশে তোমায়

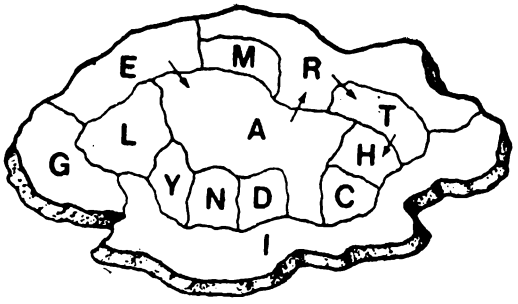

সরাসরি (directly) যেতে হবে। অবশ্য ইচ্ছে করলে তুমি দু'বার ফিরে আসতেও পার, ব্যবহৃত কোনও দেশের আদ্যক্ষর আবার ব্যবহারের জন্য। তাহলে আর দেরী নয় —এক্ষুনি দুনিয়া সফরে বেড়িয়ে পড়, 'Bon Voyage'!

দুই. মহাকবির নাটকগুলি খুঁজে বের কর।

নিচে পরপর কতকগুলি ইংরাজী বর্ণ সাজানো রয়েছে। এই বর্ণগুলির যে কোনও জায়গা থেকে শুরু করে এবং কেবলমাত্র একটা বর্ণকে পরপর সাজিয়ে (বাঁ দিকে, ডানদিকে, উপরে অথবা নিচে মহাকবি সেক্সপীয়রের কুড়িটা নাটকের নাম বলা যায় অনায়াসে।

যে কোনও নাটকের নাম তুমি প্রথমে বলতে পার. শুধু মনে রাখতে হবে বর্ণগুলিকে উপরের নির্দেশ মতো পরপর সাজানো হয়েছে কিনা। তাহলে দেখবে এই সাজানো 256টি ইংরাজী বর্ণ থেকে কেমন সুন্দরভাবে মহাকবি সেক্সপীয়রের নাটকের নামগুলি বেরিয়ে আসছে।

তিন. গোভি সাহেবের ছোটবেলার বন্ধু হলেন মিঃ ডব্লিউ এইচ হিল সাহেব। তাঁর অসাধারণ সই দেখে

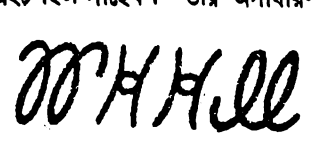

একশো বছর আগের অনেক হোমরা-চোমরা লোকেরাও অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তোমরা বুদ্ধি খাটিয়ে বলতো কি বৈশিষ্ট্য ছিল এই হিল সাহেবের সই-তে?

T	A	T	I	R	O	C	U	S	A	R	C	R	I	A	N			
S	L	E	T	D	N	I	L	A	E	L	Y	O	O	L	U			
R	N	I	U	N	L	E	L	L	K	G	M	C	E	N	S			
E	T	W	S	A	L	W	S	L	I	N	B	E	L	I	R			
R	E	A	E	R	T	H	W	E	U	J	D	N	E	M	O			
U	R	O	F	U	S	A	S	D	L	T	M	A	O	T	H			
S	M	A	M	E	A	T	E	N	I	E	A	C	T	H	E			
A	E	D	U	O	B	A	E	L	M	A	H	B	E	E	T			
S	S	I	T	N	D	O	T	T	E	N	E	N	A	M	P			
E	R	C	T	O	A	H	E	W	V	I	C	T	T	S	E			
A	N	D	H	I	U	C	L	F	F	O	T	O	N	Y	A			
S	I	O	G	N	M	N	H	T	T	T	N	A	H	D	N			
U	L	R	T	I	T	I	R	S	S	H	E	M	C	C	L			
Y	O	U	L	E	H	G	U	L	O	H	O	E	R	O	E			
S	L	L	I	K	T	B	O	E	V	N	J	I	K	P	A			
A	O	E	H	T	O	A	L	S	O	L	G	N	A	R	T			

উত্তর

এক. Algeria Afghanistan America Canada China Chile Ethiopia Germany Hawaii India Iran Ireland Italy Malaya Mal island Nigeria Newzeland Jhailand Trinidad Tahiti.

দুই. স্কোয়ারের একেবারে নিচের বাঁদিক থেকে শুরু করতে হবে—As you like it. Much Ado About Nothing. Troilus and Cressida. Measure for Measure. A winters tale. Titus Andronicus. All's Well That Ends Well. King Lear. Cymbeline Coriolanus. Rom o and Juliet. Macbeth. The Tempest. Antony And Cleopetra. King John, Love's Labour's Lost. The Merchant Of Venice. Hamlet. Twelfth Night. Othello.

T	A	T	I	R	O	C	U	S	A	R	C	R	I	A	N			
S	L	E	T	D	N	I	L	A	E	L	Y	O	O	L	U			
R	N	I	U	N	L	E	L	L	K	G	M	C	E	N	S			
E	T	W	S	A	L	W	S	L	I	N	B	E	L	I	R			
R	E	A	E	R	T	H	W	E	U	J	D	N	E	M	O			
U	R	O	F	U	S	A	S	D	L	T	M	A	O	T	H			
S	M	A	M	E	A	T	E	N	I	E	A	C	T	H	E			
A	E	D	U	O	B	A	E	L	M	A	H	B	E	E	T			
S	S	I	T	N	D	O	T	T	E	N	E	N	A	M	P			
E	R	C	T	O	A	H	E	W	V	I	C	T	T	S	E			
A	N	D	H	I	U	C	L	F	F	O	T	O	N	Y	A			
S	I	O	G	N	M	N	H	T	T	T	N	A	H	D	N			
U	L	R	T	I	T	I	R	S	S	H	E	M	C	C	L			
Y	O	U	L	E	H	G	U	L	O	H	O	E	R	O	E			
S	L	L	I	K	T	B	O	E	V	N	J	I	K	P	A			
A	O	E	H	T	O	A	L	S	O	L	G	N	A	R	T			

তিন. উল্টিয়ে দেখ—তখনও একই রকম সই!

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই

ধূমকেতু ॥ রাধাগোবিন্দ চন্দ্র 20·00

পুঁথিপত্র, 9 এ্যাণ্টনী বাগান লেন, কল-9

স্বাগতম হ্যালির ধূমকেতু ॥

অপরাজিত বসু 12·00

ভট্টাচার্য্য ব্রাদার্স, 30/1A কলেজ রো কল-9

1910 সালে যাঁরা হ্যালির ধূমকেতু দেখেছিলেন স্বর্গীয় রাধাগোবিন্দ চন্দ্র তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি তাঁর পর্যবেক্ষণের বিবরণ সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন 'ধূমকেতু' বইটিতে। হ্যালির ধূমকেতু ছাড়াও এতে রয়েছে ধূমকেতু সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ছ'টি রচনা। রচনাগুলিতে ধূমকেতুর উৎপত্তিস্থান, গঠন, উপাদান, প্রকৃতি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা ছাড়াও রয়েছে ধূমকেতু সন্ধানী কয়েকজন নক্ষত্রবিদের জীবনকাহিনী ও কয়েকটি প্রসিদ্ধ ধূমকেতু আবিষ্কারের কাহিনী। তার মধ্যে আছে বিখ্যাত ধূমকেতু সন্ধানী জীন লুইস পন্স এর কাহিনী যিনি 1801—1827 সালের মধ্যে 33টি ধূমকেতু আবিষ্কার করেছিলেন। আর একজন বিখ্যাত সন্ধানী ছিলেন উইলিয়ম রীড যিনি দু'টি নতুন ধূমকেতু আবিষ্কার করেন। এঁরা কি ভাবে ধূমকেতুর সন্ধান পেতেন, কি ধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতেন সে সবের সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায় রাধাগোবিন্দ চন্দ্রের রচনায়।

বইটিতে হ্যালির ধূমকেতু নিয়ে আলোচনা রয়েছে দু'টি অধ্যায় জুড়ে। প্রথম পর্বে রয়েছে অতীতে হ্যালির ধূমকেতুর আবির্ভাব ও তার সঙ্গে জড়িত নানা ঘটনার ঐতিহাসিক বিবরণ। দ্বিতীয় পর্বের বিষয়বস্তু 1910 সালের আবির্ভাব ও তার পর্যবেক্ষণ। এই অধ্যায়েই জনপ্রিয় লেখক হিসেবে নক্ষত্রবিদ রাধাগোবিন্দ চন্দ্রের সুনিপণ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। সে বছর 24 এপ্রিল প্রথম আবির্ভাবের দিন থেকে নিয়ে 8 জুলাই তার অন্তর্ধান পর্যন্ত হ্যালির ধূমকেতুর দৈনিক গতিবিধির নিখুঁত বিবরণ তিনি প্রস্তুত করেছেন যা থেকে ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারা যায়।

বর্ণনা ঃ

"9ই মে সোমবার অমাবস্যার পরে হ্যালির ধূমকেতুর পূর্ণ অবয়ব প্রকট হইতে থাকে। 10 মে মঙ্গলবার রাত্রি 2টা 30 মিনিটের সময় আমরা ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ আরম্ভ করি তখন কেতুর পুচ্ছের সামান্য অংশ মাত্র পূর্ব গগন-প্রান্তে দেখা দিতেছিল।···ক্রমে ধূমকেতুর তারা গোলক 3টা 12 মিনিটের সময়ে দিগ্বলয়ের উপরে অস্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল এবং 3টা 20 মিনিটের সময় সমুণ্ড বিশাল ধূমকেতু আমাদের দৃষ্টি পথবর্তী হইল।"

যদিও বইটি প্রায় ত্রিশ বছর আগে লেখা, এর মূল বিষয়বস্তু আজও সাধারণ পাঠককে আকৃষ্ট করবে। তাছাড়া বর্তমান সংস্করণে প্রয়োজন মত নতুন তথ্য ফুটনোট হিসেবে দেওয়া হয়েছে। বহু ছবি ও তথ্য

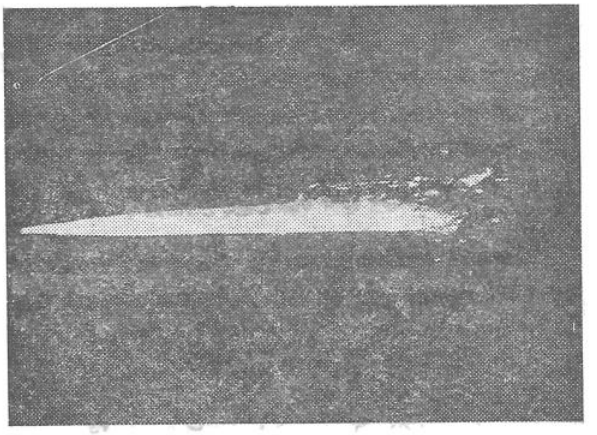

1910—হ্যালির ধূমকেতু

সম্বলিত এই বইটি পড়ে যে কোনও পাঠক যে আনন্দ পাবেন তাতে সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয় বইটির নাম দেখে পাঠকের হয়ত মনে হতে পারে যে এর মূল বিষয়বস্তু হ্যালির ধূমকেতু। কিন্তু আসলে তা নয়। বইটিতে মোট ত্রিশটি রচনার মধ্যে মাত্র একটি লেখা রয়েছে হ্যালির ধূমকেতু নিয়ে। বাকি রচনা-গুলি বিবিধ বিষয় নিয়ে তার মধ্যে সূর্য, চাঁদ, গ্রহ, তারা, পৃথিবী সবই রয়েছে। তবে বিষয়বস্তু খুবই সাধারণ হলেও লেখক অপরাজিত বসু সেগুলি এত সুন্দরভাবে প্রস্তুত করেছেন যে তা যে কোনও পাঠককে সহজেই আকৃষ্ট করবে। লেখার ভাষা সহজ, সরল অথচ বৈজ্ঞানিক তথ্যকে লেখক পরিহার করেন নি।

যদিও বইয়ের প্রথম রচনাটির মুখ্য বিষয় হ্যালির ধূমকেতু, এতে ধূমকেতু সংক্রান্ত নানা বিষয়, যেমন ধূমকেতুর উৎপত্তি, তাদের গঠন, সূর্যপ্রদক্ষিণ পথ ও পৃথিবীর ওপর তাদের প্রভাব ইত্যাদি নিয়ে আলোচনাও রয়েছে। তাছাড়া এ বইয়ে রয়েছে "উপগ্রহে প্রাণের সন্ধান', 'ধূলোয় ভরা মহাকাশ', 'গোলাপী রং এর আকাশ', 'জীবন্ত উপগ্রহ', 'সূর্যের পাগলামি', 'মহাকাশের ডাস্টবিন', 'ভূতুড়ে গ্রহ' ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কৌতূহল জাগানো বেশ কয়েকটি রচনা যা ছোট বড় সকলেরই ভাল লাগবে। তবে বইটিতে একটিও ছবি নেই, থাকলে আরও ভাল হতো। জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বইয়ে ছবি না থাকলে কেমন যেন অসম্পূর্ণ মনে হয়।

বিমান বসু

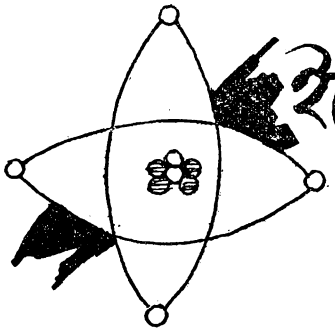

ইলেকট্রনিক্স এর কলাকৌশল

অলক চক্রবর্তী

ইলেক্ট্রনিক্স এর যাবতীয় তত্ত্ব যে কণাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে তার নাম হল ইলেক্ট্রন (electron)।

এই ইলেকট্রন হল এমন এক কণা যার ভর একগ্রামের 10^{27} ভাগের এক ভাগ, আর ব্যাসার্ধ হল এক মিলিমিটারের 4×10^{11} ভাগের এক ভাগ। একে চোখে দেখা যায় না অথবা এর ভর তুলাযন্ত্রে মাপা যায় না। আজ পর্যন্ত এমন কোণ অণুবীক্ষণ-যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নি যার সাহায্যে একে দেখা যেতে পারে।

বৈদ্যুতিক ভাবে ইলেকট্রন ঋণাত্মক তড়িৎগ্রস্ত। এই ধর্মের সাহায্যে এর উপস্থিতি নির্ণয় করা যায়। এর ঋণাত্মক তড়িতাধানের মান হল $1{\cdot}6 \times 10^{-19}$ কুলম্ব (Coulomb)। সমস্ত মৌলিক পদার্থের পরমাণুতেই প্রতিটি পরমাণু একটি কেন্দ্রক বা নিউক্লিয়াস (nucleus) এবং কেন্দ্রকের বাইরে অবস্থিত উপবৃত্তাকার অথবা বৃত্তাকার কক্ষপথে পরিভ্রমণরত এক বা একাধিক ইলেকট্রন নিয়ে গঠিত (চিত্র 1)। কেন্দ্রক আবার এক বা একাধিক প্রোটন (proton) ও নিউট্রন (neutron) নামক দুই ধরনের কণা নিয়ে গঠিত এই কণাগুলি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় বলের সাহায্যে পরস্পরের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হয়ে কেন্দ্রক গঠন করে।

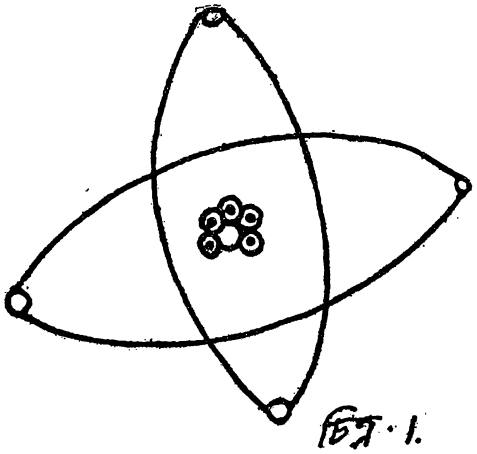

চিত্র · 1.

ইলেকট্রনের তুলনায় প্রোটন ও নিউট্রন কণিকা দুটির প্রত্যেকটির ভর প্রায় 1840 গুণ বেশি। এদের মধ্যে নিউট্রন হল তড়িৎ নিরপেক্ষ কণা যার ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক কোন রকম তড়িতাধান নেই। প্রোটন হল ধনাত্মক তড়িৎগ্রস্ত কণা যার আধানের পরিমাণ হল ইলেকট্রনের আধানের পরিমাণের সঙ্গে সমান। ($1{\cdot}6^{-19}$ কুলম্ব)।

সাধারণ অবস্থায় একটি পরমাণুতে কেন্দ্রকে অবস্থিত প্রোটনের সংখ্যা কক্ষপথগুলিতে গতিশীল ইলেকট্রনের সংখ্যার সমান হওয়ায় সামগ্রিকভাবে পরমাণুটি তড়িৎ-নিরপেক্ষ হয়। পরমাণুর অন্তর্গত কক্ষপথে পরিক্রমণরত এই রকম কোন ইকেকট্রনকে বদ্ধ ইলেকট্রন (bound electron) বলা হয়।

কখনো কখনো বাইরের বলের ক্রিয়ায় পরমাণু থেকে ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এইভাবে ইলেকট্রন হারানোর পর কোন পরমাণু আর তড়িৎ নিরপেক্ষ থাকে না, সেটি তখন ধনাত্মক তড়িৎগ্রস্ত আয়ন (ion) এ পরিণত হয়।

ঋনাত্মক তড়িৎগ্রস্ত হওয়ার ফলে ইলেকট্রন গুলি সর্বদা কোন তড়িৎ উৎসের ধনাত্মক প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত ধাতব পাতের দিকে গতিশীল হয়।

যদিও মাত্র এক শতাব্দী আগে পর্যন্ত মানুষ ইলেকট্রন সম্পর্কে কিছুই জানতো না, বর্তমানে সেই ইলেকট্রন হয়ে দাঁড়িয়েছে এমন একটি নাম যা মানব সমাজের সবত্রই কোন না কোন প্রসঙ্গে আলোচিত অথবা উচ্চারিত না হয়ে পারে না। বর্তমান কালে বহু সংখ্যক বইয়ের আলোচ্য বিষয় হল ইলেকট্রন এবং তার ধর্মাবলী। ইলেকট্রনের সর্বজনবিদিত হওয়ার পিছনে কারণটি হল এই যে আমাদের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অবদান যাবতীয় ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির মূল অথবা প্রধান উপাদান হল ইলেকট্রন।

প্রথমতঃ ইলেকট্রন হল একটি স্বল্প ভরবিশিষ্ট কণিকা যার গতিশীলতা অত্যন্ত বেশি। মহাকাশ যুগের সূচনার বহু পূর্বেই পদার্থবিদরা নলের মধ্যে গতিশীল ইলেকট্রনকে মহাজাগতিক গতিবেগে ত্বরান্বিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ ইলেকট্রন হল এমন একটি উপাদান যার কোন ক্ষয় নেই। কারোর পক্ষেই ইলেকট্রনকে বিশ্লিষ্ট করা অথবা ভাঙ্গা সম্ভব হয় নি।

তৃতীয়তঃ যতক্ষণ পর্যন্ত না তড়িৎ উৎস নিঃশেষিত হচ্ছে বা ফুরিয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত যেকোন ইলেকট্রনিক যন্ত্রে ইলেকট্রনের কোন রকম ঘাটতি অথবা অভাব ঘটে না।

এছাড়া ইলেকট্রন হল এমন একটি উপাদান যা ব্যাপকভাবে পৃথক বহুসংখ্যক অবস্থায় চমৎকার কাজ দিয়ে থাকে। যেমন শূন্যে (ইলেকট্রন নল এবং ভ্যালভগুলিতে), গ্যাসের মধ্যে (গ্যাসপূর্ণ নলগুলিতে) এবং এমনকি কঠিন পদার্থগুলিতেও (অর্ধপরিবাহীগুলিতে) ইলেকট্রন গতিশীল হতে পারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ইলেকট্রন ছাড়াও তথাকথিত প্রাথমিক কণা গোষ্ঠীর অন্যান্য সমস্ত কণিকা যেমন প্রোটন, নিউট্রন, মেসন, হাইপেরন এবং ফোটন প্রভৃতি আবিষ্কৃত হওয়ার পরেও অন্যান্য প্রাথমিক কণার বদলে ইলেকট্রন এখনও আগের মতোই তার গুরুত্ব বজায় রাখতে পারছে কিভাবে কেন ইলকট্রনিকস এর মতো প্রোটনিকস, নিউট্রানিকস ইত্যাদি গড়ে উঠছে না? অন্যান্য কয়েকটি প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে ইলেকট্রনের বৈশিষ্ট্যগুলির তুলনামূলক আলোচনা করলেই এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়।

প্রথমেই ধরা যাক নিউট্রনের কথা। নিউট্রন তড়িৎবিহীন হওয়ায় বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র ব্যবহার করে এর গতিকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় না। কিন্তু ইলেকট্রন ঋণাত্মক তড়িৎগ্রস্ত হওয়ায় তড়িৎক্ষেত্র ব্যবহার করে এর গতিকে নিয়ন্ত্রিত করার সুবিধা পাওয়া যায়।

এরপর প্রোটনের সঙ্গে ইলেকট্রনের তুলনা করতে গিয়ে দেখা যায়, ইলেকট্রনের মতো প্রোটনের গতিও তড়িৎক্ষেত্রের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করা যায়, কারণ প্রোটন ধনাত্মক তড়িৎগ্রস্ত। কিন্তু প্রোটনের ভর ইলেকট্রনের ভরের চাইতে প্রায় 1840 গুণ বেশি হওয়ায় প্রোটনের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে ইলেকট্রনের তুলনায় বেশি তীব্রতার তড়িৎক্ষেত্রে ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। অতএব তুলনামূলক বিচারে প্রোটনের তুলনায় ইলেকট্রনের গতি নিয়ন্ত্রণ করাই বেশি সুবিধাজনক।

ইলেকট্রন কে অত্যন্ত বেশি বেগে গতিশীল করা যায় বলে এবং এর গতিকে সহজে নিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ একে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ত্বরান্বিত, মন্দীভূত অথবা বিপরীতদিকে গতিশীল করা যায় বলে অতি দ্রুত কার্যসম্পাদনক্ষম ইলেকট্রনিক যন্ত্রগুলির (যেমন কম্পিউটার, যন্ত্রগণক বা ক্যালকুলেটর উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে।

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণার ফলে এপর্যন্ত যে প্রায় দুশ রকমের প্রাথমিক কণার কথা জানা গেছে তাদের মধ্যে ইলেকট্রনের মতোই যে কণাটির ব্যবহারিক উপযোগিতার দিক থেকে ব্যাপক গুরুত্ব অর্জন করার সম্ভাবনা দেখা যায় সেটি হল ফোটন (photon)। ফোটন হল এমন একটি কণা যা শুধুমাত্র গতিশীল অবস্থায় অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম। বিজ্ঞানীদের মতে স্থির অবস্থায় ফোটনের ভর শূন্য হয়ে যায়। পদার্থবিজ্ঞানের তত্ত্ব অনুযায়ী দৃশ্যমান আলোক সমেত যে কোন তড়িৎচুম্বকীয় বিকীরণ, ফোটন নিয়ে গঠিত। ফোটনের কোন কোন তড়িতাধান না থাকায় তড়িৎক্ষেত্রের সাহায্যে একে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না এবং ইলেকট্রনের চাইতে ফোটনকে নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কে স্পন্দিত করা অনেক বেশি কঠিন। কিন্তু এই সমস্ত অসুবিধা দূর করা হচ্ছে এবং শীঘ্রই ইলেকট্রনিক বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থার পাশাপাশি ফোটন ভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থাও গড়ে তোলা হবে। বর্তমানে কোয়ান্টাম স্পন্দকগুলি (Quantum Oscillatons) (যেগুলি লেসার laser নামে পরিচিত) হল ফোটনভিত্তিক যন্ত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ; অবশ্য ফোটন ভিত্তিক প্রযুক্তিবিদ্যা ভালভাবে গড়ে উঠলে যে ইলেকট্রনিকস বাতিল হয়ে যাবে তা-কিন্তু নয়। কারণ এমন অনেক বহু ক্ষেত্র আছে যেগুলিতে ইলেকট্রনিকস অপরিহার্য। তাছাড়া, ইলেকট্রনিকস এর সাহায্য ছাড়া ফোটনভিত্তিক প্রযুক্তিবিদ্যা গড়ে তোলাও সম্ভব নয়। বাস্তবিকপক্ষে যখন কোন পরমাণুতে একটি ইলেকট্রনের অবস্থা পরিবর্তন করে, যার ফলে ইলেকট্রনটি দূরবর্তী কক্ষপথ থেকে কেন্দ্রকের নিকটতর কক্ষপথে চলে আসতে পারে, তখন পরমাণুটি থেকে একটি ফোটন নিঃসরিত হয়।

অন্যান্য কণাগুলির ধর্মসমূহকে ব্যবহার করে ইলেকট্রনিকস ও ফোটনিকস ছাড়াও প্রযুক্তিবিদ্যার আরও নতুন নতুন শাখা গড়ে উঠবে কিনা সেটা বলা যায় না। নিউট্রিনো অথবা মহাকর্ষীয় তরঙ্গের সাহায্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার সম্ভাবনা সম্পর্কে এর মধ্যে কিছু চিন্তাভাবনা করা হয়েছে। কিন্তু এই ধরণের তরঙ্গ সম্পর্কে বিজ্ঞানে এখনও পর্যন্ত কোন রকম অনুসন্ধান করা হয়নি। এর ফলেই বেতার যোগাযোগের সমস্ত আধুনিক পদ্ধতিগুলির ইলেকট্রন এবং তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের পারস্পরিক ক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

যদিও ইলেকট্রনের অস্তিত্ব এবং তার ধর্মাবলী বিবেচনা করে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করা হয়েছে, তা হলেও আজ পর্যন্ত কোন সর্বাধিক শক্তিশালী অণুবীক্ষণযন্ত্রে ইলেকট্রনকে দেখা যায় নি অথবা একথাও জানা যায় নি যে ইলেকট্রন ঘন না ফাঁপা অথবা সুষম না

বিভিন্ন অংশের সমন্বয়ে গঠিত। বিগত শতাব্দীগুলিতে অসংখ্য পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে পাওয়া ফলাফলগুলির বিচার বিশ্লেষণ করে ইলেকট্রন এবং তার বিভিন্ন ধর্মাবলী সম্পর্কে সিদ্ধান্তগুলি করা হয়েছে। বর্তমান কালে ইলেকট্রন হল এমন একটি সীমানা যা বিজ্ঞান এখনও পর্যন্ত অতিক্রম করতে পারে নি। তবে ভবিষ্যতে হয়ত পারবে। ঠিক যেমন, অণু থেকে শুরু করে পরমাণু, থেকে কেন্দ্রক, প্রোটন, নিউট্রন এবং ইলেকট্রন পর্যন্ত এসে পৌঁছানো গেছে। সম্ভবতঃ প্রকৃতিতে অখণ্ড ইলেকট্রনের কোন অস্তিত্ব-নেই। তার বদলে একগুচ্ছ তরঙ্গ অথবা একাধিক ক্ষুদ্রতর কণিকার সমষ্টি বর্তমান থাকতে পারে। সেরকম ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের চোখে ইলেকট্রন বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব আর থাকবে না, কিন্তু ইলেক্ট্রানিক যন্ত্রপাতিগুর ব্যবহারিক উপযোগিতা সেদিনও পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকবে।

৭/সি, নলিন সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৪

জন্ম ঃ 21 অক্টোবর 1933 মৃত্যু ঃ 18 মার্চ 1985

ডঃ অলক চক্রবর্তী

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই প্রয়াত অধ্যাপক অলক চক্রবর্তী যুক্ত ছিলেন। বিদ্যালয় পর্যায়ের ছেলেমেয়েদের জন্য পড়াশোনা বিভাগে দীর্ঘদিন ধরে লিখেছেন। স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তক ছাড়া সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর 'ফিজিক্স ক্যুইজ' গ্রন্থটি ছাত্র ও শিক্ষক সমাজে সমধিক পরিচিতি লাভ করেছে। কর্মজীবনে তিনি শেঠ আনন্দরাম জয়পুরিয়া কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রধান ছিলেন।

গত 18 মার্চ 1985 অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে এই কৃতী অধ্যাপকের জীবনাবসান হয়।

'ইলেকট্রনিকস্ এর ক্রিয়াকৌশল' এই শিরোনামে একটি ধারাবাহিক রচনা তিনি কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাতায় শুরু করবেন ভেবেছিলেন। লেখাটির প্রথম কিস্তিও তিনি দিয়েছিলেন কিন্তু শেষ করতে পারেন নি। রচনাটি লেখকের প্রেরিত শেষ অপ্রকাশিত রচনা।

দিগন্তছোঁয়া সুবিশাল এক সমতলভূমি জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ গাছ। সবই একই আকারের। ছোট ছোট। দেখতেও একই রকম। প্রতিটি গাছের মাথায় ফুটে রয়েছে মাত্র একটি করে ফুল। সাদা-রঙের পাপ্‌ড়ি। ফুলের বোঁটা প্রায় চার ফিট্‌ লম্বা। ফুলের ঠিক নিচের অংশের বোঁটার কাছে ঘন এক গোছা লোমের মতো জিনিস। এছাড়া গ্রহটিতে না আছে জন্তু-জানোয়ার, না কোন পাখি, না কীটপতঙ্গ।

বাইরের জগতের কোন রকম উৎপাতের কথা জানা ছিল না এই গাছেদের। একদিন হঠাৎ ঈষৎ নীলবেগুনী আকাশের কোণে আবির্ভূত হল একটা কালোরঙের অচেনা জিনিস। সেটা সগর্জনে ভয়ঙ্কর গতিতে ধেয়ে এল তাদের দিকে! কিছুক্ষণ ধরে জমির সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে ঘুরল শূন্যপথে। নিচের দিকে নামতে লাগল। জমি ছুঁয়ে লাফিয়ে উঠল। আর একবার জমি ছুঁল। লাফিয়ে উঠল ফের। এমনিভাবে ওঠানামা করতে করতে সেটা শেষপর্যন্ত নেমে থামল একটা জায়গায়। নরম জমিতে বেশ একটা লম্বা নালার সৃষ্টি হয়ে গেল তারফলে কয়েকটি গাছেরও প্রাণ গেল!

তারপর কেটে গেল কিছুটা সময়। মুখথুবড়ে পড়ে-থাকা জিনিসটার ভেতর থেকে একে একে কাঁপতে কাঁপতে এল তিনজন মানুষ। তাদের চারপাশের সব গাছের ফুল-গুলো ঝুঁকে রইল তাদের দিকে। কারা এল, আগন্তুকরা গাছেদের কৌতূহল বাড়িয়ে দিল বেজায় রকম।

আকাশযানের ভেঙেপড়া কাঠামোর তৈরি নালার একজায়গায় বসে মানুষগুলো আগুন জ্বালল। জ্বলানী-তেল বের করে নিয়ে এসেছিল ভাঙা আকাশযানটি থেকে এই আগুনে কোন গাছের ক্ষতি করল না তারা। নিজেদের জন্যে খাবার তৈরি করতে করতে সূর্য অস্ত গেল আচমকা। আকাশের তারাগুলো বিস্ময়করভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বিশাল বিস্তৃত সমতলভূমিতে এখন আলো বলতে শুধু ক্যাম্পফায়ারের। এই গ্রহটিতে আবহাওয়ায় নাইট্রোজেনের মাত্রা শতকরা মাত্র পাঁচভাগ। তাই ট্যাঙ্কের সাহায্য ছাড়াই মানুষগুলো সহজভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারছিল। জ্বালাতে পেরেছিল আগুন।

প্রত্যেকটি মানুষ আহত। আতঙ্কগ্রস্ত! চারপাশের ফুলগুলোর মুখ ঘুরে রয়েছে তাদের দিকে। মানুষগুলো কী বলছে তা শোনবার জন্য যেন তৈরি হয়ে রয়েছে গাছেরা!

"আমরা এখনও পর্যন্ত বেঁচে থাকলেও মনে হয় নাগেশ্বরের জাল ছিঁড়ে পালাতে পারিনি। নাগেশ্বরের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।" বলল একজন। [শেষাংশ 45 পৃষ্ঠায়]

খুদে বৈজ্ঞানিক

দিলীপ দাস

তা ঠিক। তবে এটা জেনে রাখবি, অনেক শব্দ শ্রুত আবার কিছু শব্দ অশ্রুত।
তার মানে?
বিজ্ঞানিকেরা গবেষণা করে বের করেছেন যে, শব্দের নিম্নতম কম্পাঙ্ক কুড়ি এবং উচ্চতম কম্পাঙ্ক সেকেণ্ডে কুড়ি হাজার।
এই মর্ধ্যবর্তী কম্পাঙ্কের শব্দই আমরা শুনতে পাই। যেমন তোর ঐ—
বিউগল্!
হুঁ। বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করে বলে দেওয়া যায় ঐ বিউগলের শব্দের কম্পাঙ্ক কত। এ ছাড়া কথাবার্তা কলকারখানা বোমা ইত্যাদির শব্দও এর মধ্যে পড়ে। এগুলো হল শ্রুত শব্দ।
অশ্রুত শব্দও আবার আছে নাকি?
হুঁ। অশ্রুত শব্দ আবার দু'রকম। যে শব্দের কম্পাঙ্ক কুড়ির কম সেই শব্দকে বলে সাবসোনিক ওয়েভ এবং সেকেণ্ডে কুড়ি হাজারের উপরের শব্দের কম্পাঙ্ককে আলট্রাসোনিক ওয়েভ বলে।
যে শব্দ শোনা যায় না তা তো শব্দই নয়। তা নিয়ে মাথা ব্যাথা করা কেন?
হাঃ-হাঃ-হাঃ, আরে বুধু তোর কাছে এটা অশ্রুত হতে পারে, কিন্তু কুকুর বাদুর তিমি ইত্যাদি প্রাণী এই শব্দ শুনতে পায় এবং এর সাহায্যে নিজেদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে।
অ্যাঁ, আমার কথা কি যেন বললো!
বর্তমানে বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে, এমন কি চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই অশ্রুত শব্দকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এই সুপারসোনিক ওয়েভকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর অপরাধী ধরতে পুলিশকে সাহায্য করছে।

মানে আমাকে অশিক্ষিত বলা! জানে কি আমিও ঐ অশ্রুত শব্দ শুনতে পাই?

সমুদ্রে মাছ ধরতে, জাহাজ কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করতে এমন কি সমুদ্রের গভীরতা মাপতে ইত্যাদি নানা কাজে এই শব্দ তরঙ্গকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

যখন শব্দকে জব্দ করার জন্য সবাই উঠে পড়ে লেগেছে তখন শব্দের এই বেয়াদপি বেশ দুর্ভাবনার কথা!

অ্যাঁ! এখন তাহলে সাবানকোম্পানিগুলো কি করবে?

4/86

না। সেটা হল এই সব যান্ত্রিক শব্দের ক্ষেত্রে, যা বিনা মানুষকে উৎপীড়িত করে। যেমন তোর এই—

পোঁপর পোঁ পোঁপর পোঁ

এখন এই শব্দের কম্পাঙ্ককে বাড়িয়ে সেকেণ্ডে বিশ হাজারের উপরে তুলে দিলেই তোর শ্রবণ শক্তি আর কাজ করবে না। অর্থাৎ শব্দটা শুনতে পাবি না।

তোর ভালর জন্যই বলছি— ও চেষ্টা ঘরের মধ্যে করিস না!

তারপর পোঁ পোঁপর পোঁ

এ তো শব্দের কম্পাঙ্ক নয়, রীতিমতো হাদকম্প তুলে দিচ্ছে!

কি বুঝলি?

কি বুঝবো! বিশ হাজারের ওপরে? তা আমি বলবো কেমন করে?

এইবার দ্যাখ।

ভ্যাপর প্যোঁ
প্যাপর প্যোঁং
ভ্যাপর পোঁ
এইই মরেছে! পিসিমা এসে পড়েছে! এত করে ওর শব্দের কম্পাঙ্ক কুড়ি হাজারের উপরে তুলতে পারলো না!
ভ্যাঁপস্!
ছাগল কোথাকার! ঘরের মধ্যে এসব কি হচ্ছে? তোর কি মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে নাকি?
তখন আমার নিষেধ শুনলো না, এখন বোঝ ঠ্যালা!
ক-ক-কে? প-পিসিমা!
দুপুর বেলা-বলা নেই কওয়া নেই প্রাণ পাখি খাঁচাছাড়া হবার যোগাড় করেছে!
মাঠ নেই? রাস্তা নেই? জাহান্নামে যা, ওখানে গিয়ে যত ইচ্ছে শব্দ কর গে গর্দভকোথাকার!
ও-ওটা আমার নয় পিসি, ন্যাপার। আমি ওকে শব্দের শ্রুত অশ্রুত এবং তার কম্পাঙ্ক সম্বন্ধে বোঝাচ্ছিলুম!
ফের যদি আবার এখানে ঐ কম্পাঙ্ক তুলতে শুনেছি কি-লাস ফেলে দেব! মনে থাকে যেন।
উপস্!
পিসিমা গেছে! বিউগলটা নিতে এসেছি। ইস্, এ কি করেছিস! গেল আমার মহড়া!
আমি নয়-পিসিমা!
এখন দেখছি সাইলেন্সারটা তুই লাগিয়ে নিলেই ভাল করতিস। তাতে তোর শব্দ অশ্রুতই থাকতো।
হিকস্!

জারণ ও বিজারণ বিবেক রায়

রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রকারভেদ তোমাদের মোটামুটি জানা আছে। সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ, বিয়োজন, সংযোজন, প্রতিস্থাপন, যুগ্ম প্রতিস্থাপন, প্রশমন ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর রাসায়নিক বিক্রিয়া তোমাদের অজানা নয়। এগুলি ছাড়াও আর এক শ্রেণীর রাসায়নিক বিক্রিয়া আছে ; যাদের আমরা জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া আখ্যা দিয়ে থাকি। জারণ ও বিজারণ বস্তুতঃ দুটি পৃথক বিক্রিয়া, কিন্তু এককভাবে এদের কোনটিই ঘটে না বলে আমরা একত্রে এদের 'জারণ-বিজারণ' আখ্যা দিয়ে থাকি। কাজেই মনে রেখো, প্রতিটি জারণ বিক্রিয়ার সঙ্গে বিজারণ বিক্রিয়াও ঘটে। এখন এসো, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আমরা জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া অধ্যায়টিকে রপ্ত করার চেষ্টা করি।

1. জারণ বিক্রিয়া কাকে বলে ?

উত্তর ঃ যে প্রক্রিয়ায় কোন পদার্থের সঙ্গে অক্সিজেন কিংবা কোন তড়িৎ ঋণাত্মক মৌল বা মূলক যুক্ত হয় অথবা কোন পদার্থ থেকে হাইড্রোজেন কিংবা অন্য কোন তড়িৎ ধনাত্মক মৌল বা মূলক অপসারিত হয়, তাকে জারণ বিক্রিয়া বলে।

2. বিজারণ বিক্রিয়া কাকে বলে ?

উত্তর ঃ যে প্রক্রিয়ায় কোন পদার্থের সঙ্গে হাইড্রোজেন কিংবা তড়িৎ ধনাত্মক মৌল বা মূলক যুক্ত হয় অথবা কোন পদার্থ থেকে অক্সিজেন কিংবা অন্য কোন তড়িৎ ঋণাত্মক মৌল বা মূলক অপসারিত হয়, তাকে বিজারণ বিক্রিয়া বলে।

3. (i) $C+O_2=CO_2$ এবং (ii) $SnCl_2+Cl_2=SnCl_4$ বিক্রিয়া দুটি কি ধরনের বিক্রিয়ার উদাহরণ এবং কেন ?

উত্তর ঃ প্রথম বিক্রিয়ায় অক্সিজেন সংযোগ দ্বারা কার্বন জারিত হ'য়ে কার্বন ডাই অক্সাইডে পরিণত হয়েছে। এটি জারণ বিক্রিয়ার উদাহরণ। দ্বিতীয় বিক্রিয়ায় স্ট্যানাস ক্লোরাইডের সঙ্গে তড়িৎ ঋণাত্মক মৌল ক্লোরিনের সংযোগে বা পরিমাণ বৃদ্ধির দ্বারা স্ট্যানাস ক্লোরাইড জারিত হয়ে স্ট্যানিক ক্লোরাইডে পরিণত হয়েছে। এটিও জারণ বিক্রিয়ার উদাহরণ।

4. (i) $Cl_2+H_2S=2HCl+S$ এবং (ii) $HgCl_2+Hg=Hg_2Cl_2$ বিক্রিয়া দু'টি কি ধরনের বিক্রিয়ার উদাহরণ এবং কেন ?

উত্তর ঃ প্রথম বিক্রিয়ায় ক্লোরিনের সঙ্গে হাইড্রোজেন সালফাইডের রাসায়নিক সংযোগে ক্লোরিন বিজারিত হয়ে HCl-এ পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে হাইড্রোজেন সংযোগে ক্লোরিন বিজারিত হয়েছে HCl-এর। দ্বিতীয় বিক্রিয়ায় দেখা যাচ্ছে যে, তড়িৎ ধনাত্মক মৌল মারকারি সংযোগে মারকিউরিক ক্লোরাইড বিজারিত হ'য়ে মারকিউরাস ক্লোরাইডে পরিণত হয়েছে।

5. নিচের সমীকরণ দুটির প্রত্যেকটিতে কোন্‌টি জারিত এবং কোন্‌টি বিজারিত হয়েছে ?

(i) $Zn+H_2SO_4=ZnSO_4+H_2$

(ii) $2KI+Cl_2=2KCl+I_2$

উত্তর ঃ প্রথম বিক্রিয়ায় Zn জারিত এবং H_2SO_4 বিজারিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিক্রিয়ায় KI জারিত এবং Cl_2 বিজারিত হয়েছে।

6. কি ক'রে প্রমাণ করবে যে জারণ ও বিজারণ ক্রিয়া একই সঙ্গে ঘটে ?

উত্তর ঃ জারক দ্রব্য জারণ ক্রিয়ার সময় নিজে বিজারিত হয়। অপরপক্ষে বিজারক দ্রব্য কোন পদার্থকে বিজারিত করতে গিয়ে নিজে জারিত হয়। উত্তপ্ত কপার অক্সাইড এর উপর দিয়ে হাইড্রোজেন গ্যাস চালনা করলে কপার অক্সাইড অক্সিজেন হারিয়ে ধাতব কপাররূপে বিজারিত হয়। $CuO+H_2=Cu+H_2O$. বিক্রিয়ার সময় বিজারক দ্রব্য হাইড্রোজেন, অক্সিজেন গ্রহণ করে জলে জারিত হয়।

7. জারক দ্রব্যের কাজ কি ?

উত্তর ঃ জারক দ্রব্যের কাজ হলো অন্য পদার্থকে অক্সিজেন ও অক্সিজেনের মতো অপরাতড়িৎধর্মী মৌল সরবরাহ করা। এ ভিন্ন জারক দ্রব্য অন্য পদার্থ থেকে হাইড্রোজেন ও হাইড্রোজেনের মতো পরা তড়িৎধর্মী মৌল অপসারণ করে।

8. বিজারক দ্রব্যের কাজ কি ?

উত্তর ঃ বিজারক দ্রব্যের কাজ হলো অন্য পদার্থ থেকে অক্সিজেন ও অক্সিজেনের মতো অপরাতড়িৎধর্মী মৌল অপসারণ করা। এ ভিন্ন বিজারক দ্রব্য অন্য পদার্থের সঙ্গে হাইড্রোজেন ও হাইড্রোজেনের মতো পরাতড়িৎধর্মী মৌলের সংযোগ ঘটায়।

9 নিচের কোন্‌গুলি জারক এবং কোনগুলি বিজারক দ্রব্য ?

(i) HNO_3 (ii) H_2O_2 (iii) I_2 (iv) H_2S (v) $KMnO_4$ (vi) SO_2

উত্তর ঃ জারক দ্রব্য ঃ HNO_3, H_2O_2, I_2, $KMnO_4$

বিজারক দ্রব্য ঃ H_2S, SO_2.

এন. বি. টি—99A, নিউট্রাফিক, খড়্গপুর।

পদার্থ-বিদ্যার কথা অজয় চক্রবর্তী

জাড্য পদার্থের একটি সাধারণ ধর্ম। অর্থাৎ, পদার্থ-মাত্রেরই জাড্য আছে। যার জাড্য নেই তাকে 'অপদার্থ' ছাড়া কিছু বলা যাবে না। তোমাদের মধ্যে উদ্যমের অভাব দেখে, কিংবা জড়তা দেখে যদি কেউ তোমাদের 'অপদার্থ' বলে গালি দেয় তাহলে তোমরা তার ভুল ধরিয়ে দিয়ে বলতে পারো যে, তোমরা পদার্থ বলেই তোমাদের জড়তা আছে। জড়তা না থাকলেই বরং তোমাদের 'অপদার্থ' বলা যুক্তিযুক্ত হতো। পদার্থ-বিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায়, যে-যতো বেশি পরিমাণে 'পদার্থ' তার জড়তাও ততো বেশি। যে-ব্যক্তি তালপাতার সেপাই তার শরীরের জাড্য অতি সামান্য,—জোরে বাতাস বইলেই সে উড়ে যেতে পারে। আর, যে-ব্যক্তি বিশাল বপুর অধিকারী তার জড়তাও সে পরিমাণে বিপুল। ছোট ধূলিকণা বায়ুবাহিত হয়ে ওড়াওড়ি করে, একখণ্ড পাথর কদাচ তেমন করে না। ছোট বস্তুতে পদার্থের পরিমাণ কম বলেই ছোট বস্তুর জাড্য কম। বড় বস্তুতে পদার্থের পরিমাণ বেশি বলে জাড্যও বেশি। একখণ্ড কাঠের চেয়ে সম-আয়তন একখণ্ড সীসার জাড্য অনেক বেশি। এর কারণ এই যে কাঠের চেয়ে সীসা অনেক বেশি নিরেট। যে বস্তু যতো বেশি পদার্থে ঠাসা সে-বস্তুর জাড্য ততো বেশি। অর্থাৎ, কোন বস্তুর জাড্য তাতে বিদ্যমান পদার্থের পরিমাণ নির্দেশ করে। 'পদার্থের পরিমাণ' অর্থে পদার্থবিজ্ঞানে 'ভর' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কাজেই বলা যায়, কোন বস্তুর ভর ঐ বস্তুটির জাড্যের পরিমাপ নির্দেশ করে।

ভর একটি মৌলিক রাশি, কেননা অন্য কোন রাশির সাহায্যে ভরকে প্রকাশ করা যায় না। এর সংজ্ঞাও দেওয়া যায় না। এজন্য, ভরকে পদার্থবিজ্ঞানের একটি 'মৌলিক অসংজ্ঞক' হিসেবে ধরতে হবে। বলবিজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনায় আরও দু'টো মৌলিক অসংজ্ঞকের ব্যবহার প্রচলিত আছে। এর একটি হলো সময় এবং অন্যটি হলো দৈর্ঘ্য। ভরের যেমন সংজ্ঞা দেওয়া যায় না তেমনি দৈর্ঘ্য এবং সময়ের সংজ্ঞা দেওয়াও সম্ভবপর নয়।

নিউটনের প্রথম সূত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা 'বল' (force) শব্দটির উল্লেখ করেছি। বল পদার্থ-বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাশি। নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে বলের প্রকৃতিগত পরিচয় পাওয়া গেছে। এ সূত্র থেকে আমরা বলকে বেগের পরিবর্তনের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছি। কিন্তু প্রথম সূত্র থেকে বলের পরিমাপ সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত দেওয়া হয় নি। নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে, কোন বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার বস্তুটির ওপর ক্রিয়াশীল অপ্রতিমিত (unbalance) বলের সমানুপাতিক এবং বল যেদিকে ক্রিয়া করে বস্তুটির ভরবেগের পরিবর্তনও ঘটে সে-দিকে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, নিউটন তার 'প্রিন্সিপিয়া' গ্রন্থে 'ভরবেগ' শব্দটি ব্যবহার করেন নি—ভরবেগ অর্থে তিনি ব্যবহার করেছেন 'গতির পরিমাণ' (quantity of motion)। ব্যাপারটা তাৎপর্যপূর্ণ। কোন বস্তুর ভর এবং বেগের গুণফলকে আমরা 'ভরবেগ' বলি। এই রাশিটিকে 'গতির পরিমাণ' বলার কারণ কি ?

কোন বস্তুর ওপর অপ্রতিমিত বল ক্রিয়া করলে বস্তুটির বেগ বাড়তে থাকে। যতো বেশি সময় ধরে বল ক্রিয়া করে বস্তুটির অন্তিম বেগ ততো বেশি হয়। বিভিন্ন ভরের দুটো বস্তুর ওপর যদি একই মানের বল একই সময় ধরে ক্রিয়া করে তবে কোন্ বস্তুতে বেশি বেগ সঞ্চারিত হবে ? যে-বস্তুটির ভর অপেক্ষাকৃত কম তার জাড্যও কম ; কাজেই, অপেক্ষাকৃত হাল্কা বস্তুটিতেই বেশি বেগ সঞ্চারিত হবে। বস্তু দুটোর ক্ষেত্রে বেগের পরিবর্তন বিভিন্ন হলেও ভরবেগের পরিবর্তন কিন্তু একই হবে। অর্থাৎ ক্রিয়াশীল বলের মান এবং বলের ক্রিয়াকাল নির্দিষ্ট হলে সমস্ত বস্তুরই ভরবেগের পরিবর্তন সমান হয়। কাজেই ভরবেগকে বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল বলের 'সঞ্চিত ফল' (accumulated effect) বলা যায়। দেখা গেছে যে, যে-বস্তুর ভরবেগ যতো বেশি তাকে থামানো তত শক্ত। যে-গতিশীল বস্তুকে থামানো যতো বেশি আয়াসসাধ্য তার 'গতির পরিমাণ' ততো বেশি একথা বলা বোধকরি অযৌক্তিক নয়। এ শক্তিই নিউটন ভরবেগকে 'গতির পরিমাণ' বলেছিলেন।

ভরবেগ রাশিটির তাৎপর্য পুরোপুরি বুঝতে হলে 'বেগ'-এর অর্থ স্পষ্ট হওয়া দরকার। কাজেই, নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্রের বিস্তৃততর আলোচনার আগে বেগ এবং বলবিজ্ঞানের আর কয়েকটি মূল রাশির তাৎপর্য ভালভাবে বুঝে নিই।

কোন বস্তু যখন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায় তখন বস্তুটির স্থান-পরিবর্তনকে পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় 'সরণ'। কোন বস্তুকণা স্থানচ্যুত হবার সময় সোজাপথেই যাক কিংবা বাঁকা পথেই যাক—সরণের অভিমুখ বলতে আমরা সবসময় বুঝবো আলোচ্য বস্তুকণার প্রাথমিক

অবস্থান এবং অন্তিম অবস্থানের সংযোজী সরলরেখার অভিমুখ। ধরা যাক, খেলার মাঠে তুমি 'ক' স্থান থেকে ফুটবল পায়ে নিয়ে আঁকা-বাঁকা পথে বিপক্ষের খেলোয়াড়-দের কাটিয়ে 'খ' স্থানে এসে গোল লক্ষ্য করে 'শট্' করলে। (নীচের চিত্র দেখ)।

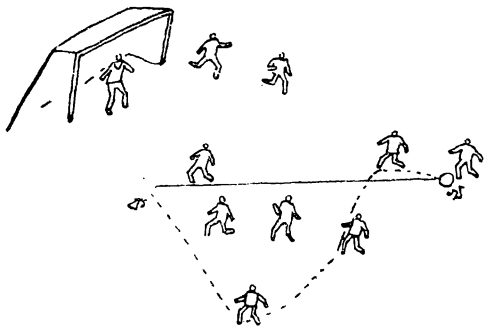

'ক' থেকে 'খ' অবস্থানে আসতে তুমি যতোটা পথই অতিক্রম করে থাকো না কেন, পদার্থবিজ্ঞানী বলবেন, তোমার সরণ ক-খ সরলরেখার সমান। এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে, অন্তিম অবস্থান প্রাথমিক অবস্থান নির্দিষ্ট বলে সরণের অভিমুখও নির্দিষ্ট। সরণের একটি নির্দিষ্ট দিক আছে বলে একে সঠিক রাশি বলা যায়। পদার্থবিজ্ঞানে এমন রাশির অভাব নেই। পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় সঠিক রাশির নাম হলো 'ভেক্টর রাশি'।

কোন বস্তুর সরণের হারকে তার বেগ বলা হয়। সরণ একটি সঠিক রাশি ; কাজেই বেগও সঠিক রাশি। এ প্রসঙ্গে দ্রুতির সঙ্গে বেগের পার্থক্য লক্ষণীয়। কোন বস্তু একক সময়ে যে-দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে বস্তুটির 'দ্রুতি' বলা হয়। এ দূরত্ব বাঁকা পথেও হতে পারে, সোজা পথেও হতে পারে। অর্থাৎ, বস্তুর দ্রুতি বলতে আমরা গতির কোন দিক নির্দেশ করি না—একক সময়ে বস্তুটি যে-দূরত্ব পার হয় তা থেকেই বস্তুটির দ্রুতির পরিমাপ করা হয়।

এক্ষেত্রে কোন দিক-নির্দেশের প্রয়োজন হয় না বলে দ্রুতি একটি নির্দিক রাশি। পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় নির্দিক রাশিগুলোকে বলা হয় 'স্কেলার রাশি'। কাজেই বেগ ভেক্টর রাশি, কিন্তু দ্রুতি স্কেলার রাশি।

বেগ সঠিক রাশি বলে বেগের দিক-পরিবর্তনও বেগের পরিবর্তন সূচিত করে। নিউটনের প্রথম সূত্র অনুসারে, বলের ক্রিয়া ছাড়া কোন বস্তুর বেগের কোন পরিবর্তন হয় না। কাজেই, যে-বাহ্যিক প্রভাব বস্তুর বেগের মান বা দিক উভয়ের পরিবর্তন ঘটায় তাকেই 'বল' বলা যায়। বেগের পরিবর্তনের হারকে বলা হয় 'ত্বরণ'। বেগ সঠিক রাশি, কাজেই ত্বরণও সঠিক রাশি। নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা পাই,

বল ∝ ভরবেগের পরিবর্তনের হার
∝ ভর × বেগের পরিবর্তনের হার
∝ ভর × ত্বরণ

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, কোন বস্তুর ভর এবং ত্বরণের গুণফল বলের সমানুপাতিক। এখানে সমানুপাতিক ধ্রুবকটি কী হবে ? বলের এককের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে এই সমানুপাতিক ধ্রুবকটির মান স্থির করা যায়। যে-বল একক ভরবিশিষ্ট বস্তুর ওপর ক্রিয়া করে তাকে একক বল হিসেবে ধরলে সমানুপাতিক ধ্রুবকটির মান 'এক'। বলের একক সেভাবে ঠিক করে নিয়ে লেখা যায়।

বল = ভর × ত্বরণ

আমরা জানি যে,

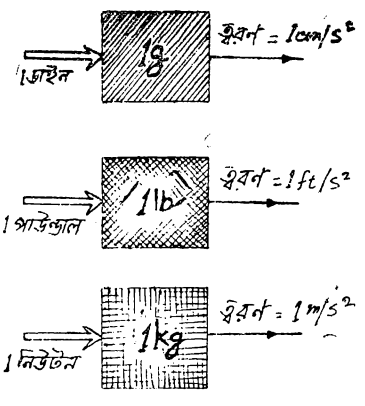

$$\text{ত্বরণ} = \text{বেগের পরিবর্তনের হার} = \frac{\text{বেগের পরিবর্তন}}{\text{সময়}}$$

$$= \frac{\text{সরণের পরিবর্তন/সময়}}{\text{সময়}} = \frac{\text{সরণের পরিবর্তন}}{(\text{সময়})^2}$$

'সরণের পরিবর্তন' প্রকৃতপক্ষে একটি দৈর্ঘ্য নির্দেশ করে। সুতরাং ত্বরণের একক $= \frac{\text{দৈর্ঘ্যের একক}}{(\text{সময়ের একক})^2}$

ভৌত রাশির একক নির্ধারণে তিনটি পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। যে-পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক 'সেন্টিমিটার', ভরের একক 'গ্রাম', এবং সময়ের একক 'সেকেন্ড' সে-পদ্ধতিকে বলা সি· জি· এস· পদ্ধতি। যে-পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক 'ফুট', ভরের একক 'পাউন্ড' এবং সময়ের একক 'সেকেন্ড' সে-পদ্ধতিকে বলা হয় এফ· পি· এস· পদ্ধতি। আর, যে পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক 'মিটার', ভরের একক 'কিলোগ্রাম' এবং সময়ের একক 'সেকেন্ড' তাকে বলা হয় এম· কে· এস· পদ্ধতি।

ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বর্গসংখ্যার এককের প্রতিসমত্ব

সজল চক্রবর্তী

প্রতিসমত্ব বা Symmetry কি, প্রথমে তা বুঝিয়ে নিই।...

কোনো বস্তুর ঠিক মাঝখান দিয়ে একটি সরলরেখা টেনে, ঐ সরলরেখাকে স্থির রেখে দুই পাশের অংশকে ভাঁজ করলে, এক অংশ অপর অংশের সাথে যদি হুবহু মিলে যায়, অর্থাৎ একেবারে খাপে-খাপে, তবে বস্তুটিকে প্রতিসম বস্তু বলে।...অথবা অন্যভাবে বললে, বলতে হয়—ঐ সরলরেখার থেকে দু-দিকে সমদূরত্বে অবস্থিত জিনিষগুলো একই হয়।...এবং বস্তুর এই ধর্মটিকে প্রতিসমত্ব বলে ?

প্রতিসম বস্তুর কিছু উদাহরণ দিচ্ছি, যেমন—বৃত্ত, ইংরাজী বর্ণ A. H. M. O, T, V, W, X, Y আয়তক্ষেত্র, বর্গক্ষেত্র...ইত্যাদি ইত্যাদি।

...এবার আসল কথায়, অর্থাৎ বর্গসংখ্যার এককের প্রতিসমত্বে আসছি।...শূন্য (0)-র কথা ছেড়েই দিলাম।.... যে কোনো সংখ্যার এককের স্থানে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-এর মধ্যে যে-কোনো একটি অঙ্ক থাকবে।...

তা হ'লে স্পষ্টতই ঃ—

যে-কোনো সংখ্যার একক→1 2 3 4 5 6 7 8 9

∴ বর্গ সংখ্যা→1 4 9 1(6) 2(5) 3(6) 4(9) 6(4) 8(1)

∴ বর্গসংখ্যার একক→1 4 9 6 [5] 6 9 4 1

যেহেতু নয়টি অঙ্ক আছে, স্পষ্টতই শ্রেণীটির মধ্যবর্তী অঙ্ক 5। এবার '5' এর ডান এবং বামদিকে তাকিয়ে দেখ বেশ সুন্দর একটা মিল আছে। অর্থাৎ '5' এর ডানদিকে 1ম অঙ্ক 6, বাঁদিকেও তাই। ডানদিকে 2য় অঙ্ক '9' বাঁদিকেও তাই!....অর্থাৎ '5' এর দুদিকে সমদূরত্বে এক-ই অঙ্ক বর্তমান। অর্থাৎ একটা প্রতিসমত্ব আছে!.... এবং এই শ্রেণীটিকে দেখলে মনে হয় না-কি—কেউ যেন অগোচরে মজাদার এই শ্রেণীটি বানিয়ে রেখেছে!

3-কে, নস্কর পাড়া লেন, ঢাকুরিয়া, কল-31।

ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের মেলা

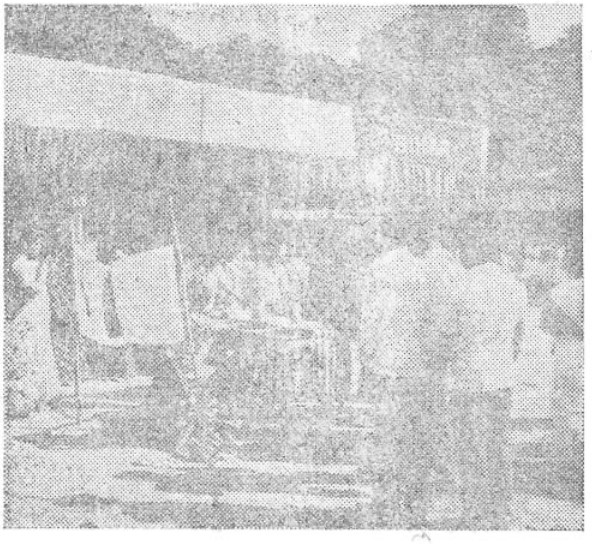

বহু মডেলের এক প্রদর্শনী হয়ে গেল 1986-র 16—21 ফেব্রুয়ারী কলকাতার সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল চার্চের প্রাঙ্গণে। উদ্যোক্তা ছিলেন কলকাতার বিড়লা শিল্প ও কারিগরি সংগ্রহশালা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগ ও বিভিন্ন পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য সমূহের শিক্ষা দপ্তর। অংশগ্রহণ করেছিলেন সমগ্র পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ ও বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্লাব। তাই মেলার নাম দেওয়া হয়েছিল 'পূর্ব ভারত বিজ্ঞান মেলা ও কর্ম শিবির।'

এখানকার এই সব ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত মডেলগুলির মধ্যে প্রধান ছিল শক্তি রূপান্তরের বিভিন্ন পদ্ধতি, জ্বালানী সাশ্রয়, সাইকেলের প্যাডেলের ঘূর্ণনকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন কাজ ও ইলেকট্রনিক্সের তৈরী কিছু স্বয়ংক্রিয় মডেল।

ভারতের নানা রাজ্য ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিভিন্ন জেলাগুলির বিদ্যালয়গুলি অংশগ্রহণ করছিল।

চন্দননগরের কানাইলাল বিদ্যামন্দিরের ছাত্র কৌশিক চ্যাটার্জি, গঙ্গার বুকে পতিত বর্জ্য পদার্থগুলি দিয়ে কি কি প্রয়োজনীয় জিনিস প্রস্তুত হতে পারে তা দেখাচ্ছিল।

শিলিগুড়ি বয়েজ হাই স্কুলের ছাত্র সুদীপ সেনগুপ্ত ইলেকট্রনিক্স মডেলের সাহায্যে বুঝিয়ে দিচ্ছিল স্বয়ংক্রিয়ভাবে রাস্তার লাইট কি ভাবে দিনে নিভবে ও রাত্রে জ্বলবে।

কানাইলাল ব্যানার্জী,
1 মোনমোহন বসু স্ট্রীট, কলকাতা-6

গুপ্তধন

সঙ্কর্ষণ রায়

গিরিডিতে বিষেণলালের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আমার। সেখানে তাঁর অভ্রের কারবার আছে। খনি থেকে কিনে আনা অভ্র কাট-ছাঁট ক'রে বিদেশে রপ্তানি করা তাঁর পেশা। এই পেশা ছাড়া একটি নেশা নিয়ে মেতেছিলেন তিনি। রাজস্থানে যোধপুরের কাছে থর মরুভূমির মধ্যে তিনি নাকি গুপ্তধনের হদিশ পেয়েছিলেন। সময় পেলেই সেখানে গিয়ে তার সন্ধান নিতেন। আমার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর একদিন তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে এই গুপ্তধনের গুপ্তকথা ব্যক্ত করেছিলেন আমার কাছে।

আসলে এই গুপ্তধনের হদিশ পেয়েছিলেন তিনি একটি পুঁথির মধ্যে। পুঁথিটা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর প্রপিতামহের আমলের সিন্দুকে। পুঁথিতে যা আছে তার পাঠোদ্ধার ক'রে তিনি শুধু এইটুকু বুঝতে পেরেছিলেন যে যোধপুরের কাছে তেওরির পশ্চিমে থর মরুভূমির বালির মধ্যে তা চাপা আছে। চাপা থাকলেও তা নাকি চাপা থাকবে না, যার দেখার মত চোখ আছে তার চোখকে নাকি তা ফাঁকি দিতে পারবে না। কিন্তু মাসের পর মাস খোঁজাখুঁজির করার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে চোখের দৃষ্টি তাঁর যতই প্রখর হোক, দেখার মত চোখ তাঁর নেই।

আমাকে সব কথা বলার পর বিষেণলাল আমার সাহায্য চাইলেন, এই গুপ্তধন খুঁজে বের করতে অনুরোধ করলেন আমাকে। আমি তখন এম. এস-সি পরীক্ষা দিয়ে তার ফলের প্রতীক্ষায় আছি, কাজেই তাঁর অনুরোধ রাখতে কোন অসুবিধে হয় নি। তাঁর সঙ্গে চলে যাই যোধপুর—তারপর শুরু করি অনুসন্ধান পর্ব।

তেওরির পশ্চিমে বালির সমুদ্রে পাড়ি দিই উটের পিঠে চেপে। যতদূর দৃষ্টি চলে বালি ছাড়া আর কিছু নেই। বালির মধ্যে স্বচ্ছন্দে চলে উটটা। বালির মধ্যে জায়গায় জায়গায় চোরাবালি লুকোনো আছে, চোখে দেখে তা চেনার উপায় নেই। কিন্তু উটের সহজাত ক্ষমতা আছে কতো চিনে নেওয়ার। সে অনায়াসে তার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলে। রীতিমত ভারি তার শরীর, কিন্তু বালির ওপরে দিব্যি হালকাভাবে পা ফেলে চলতে পারে। তা' ছাড়া ওকে নিয়ে আর একটা মস্ত সুবিধে আমাদের। সেটা হচ্ছে খাদ্য ও পানীয় বিনা তার ক্ষিধে ও তেষ্টা মেটাবার ক্ষমতা। তার পিঠের কুঁজ ও পাকস্থলীর মধ্যে জমা চর্বি একটানা দু' সপ্তাহ ধ'রে তাকে পুষ্টি জোগায় ও তার তেষ্টা মেটায়।

কিন্তু দিনের পর দিন বালির মধ্যে ঘোরাঘুরি ক'রে

বালি ছাড়া আর কিছু দেখতে পাই না। মাঝে মাঝে অবশ্য কিছু কাঁটাঝোপ চোখে পড়ে, কিন্তু বালির মধ্যে এমন কোন বিশেষত্ব নেই যা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে।

সেদিনও অন্য সব দিনের মত নিস্পৃহভাবে বালি ও কাঁটাঝোপগুলোকে দেখতে দেখতে এগিয়ে যাচ্ছি। প্রখর রৌদ্রে ঝলমল করছে বালি—তার দিকে তাকানোই যায় না। অগত্যা তাকাই কাঁটাঝোপগুলির দিকে। দেখবার মত না হলেও দেখতে থাকি।

কাঁটাঝোপগুলোকে দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার ওদের মানচিত্রের মধ্যে চিহ্নিত ক'রে ফেলার ঝোঁক চাপল। উটের পিঠ থেকে নেমে কম্পাসের সাহায্যে মানচিত্রের ওপরে আমাদের অবস্থান নির্ণয় ক'রে কাঁটাঝোপগুলোকে মানচিত্র-বদ্ধ করতে থাকি। দিন কয়েকের মধ্যেই মরুভূমির বালির পটভূমিকায় কাঁটাঝোপগুলোর মোটামুটি একটা ছবি ফুটে উঠল মানচিত্রের মধ্যে। বিষেণলালকে তা' দেখাতেই তিনি বললেন, কাঁটাঝোপের ম্যাপ করেছেন! এর থেকে গুপ্ত-ধনের হদিশ পাবেন নাকি?

—জানি না পাব কি-না। আমি জবাব দিলাম, তবে পেতেও পারি। তার জন্য আরও ভাল ক'রে দেখা দরকার।

—আরও ভাল ক'রে দেখা! আমার মুখের দিকে অবাক হ'য়ে তাকান বিষেণলাল: এত দিন ধ'রে এত দেখা হ'ল—এর পরে আরও ভাল ক'রে দেখার কি আছে কিছু?

—আছে বই কি। আমি জবাব দিলাম, দেখার কি শেষ আছে! এতদিন দিনের আলোয় দেখেছি, এখন রাতের আঁধারে দেখব।

—রাতের আঁধারে দেখবেন মানে। বিষেণলালের চোখ দুটি বিস্ফারিত হ'য়ে ওঠে: আঁধারে কিছু দেখা যায় না কি?

—যায় হয়তো। হয়তো এমন কিছু আছে যা রাতের আঁধারেই চোখে পড়ে।

আমার কথার উত্তরে কোন কথা বললেন না বিষেণলাল। কিন্তু তাঁর মুখের ভাবে বোধ হ'ল, আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দিহান হ'য়ে উঠেছেন তিনি।

রাতের আঁধারে সত্যিই কিছু চোখে পড়ে কিনা তা পরখ করার জন্য সেদিন রাত্রেই উটের পিঠে চেপে বেরিয়ে পড়লাম। আমার পাগলামির অংশীদার হওয়ার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা ছিল না বিষেণলালের, তথাপি আমার সঙ্গ নিলেন আমাকে একা ছেড়ে দিতে পারেন না ব'লে।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। অন্ধকারে মরুভূমিকে মরুভূমি ব'লে মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে যেন একটা অন্ধকারের সমুদ্র। ওপরের আকাশটাও যেন একটা অন্ধকারের সমুদ্র। ওপরের আকাশটাও যেন একই আঁধার দিয়ে গড়া, তার মধ্যে তারাগুলো যেন লক্ষ লক্ষ চুমকির মত বসানো।

অন্ধকারের মধ্যে প্রায় দিশেহারা হ'য়ে পড়ার মত অবস্থা হ'লেও আমরা দিশেহারা হই না, কারণ আমরা জানি যে আমাদের উট দিশেহারা হ'বে না। এই মরুভূমির প্রতি ইঞ্চি জমি ওর মুখস্থ, গভীর অন্ধকারের মধ্যে পা দিয়ে বালি ছুঁলেই বুঝতে পারে কোথায় এসেছে সে। আমাদের একান্ত বিশ্বাস, অন্ধকারে এলোপাথারি ঘোরাঘুরির পরও সে ঠিক ফিরিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের যোধপুরে।

অন্ধকারের মধ্যে ঘণ্টাদুয়েক ঘোরাঘুরির পর বিরক্ত হ'য়ে বিষেণলাল বললেন, পাগলের মত আর কত ঘুরবেন এই অন্ধকারের মধ্যে।

—ঘোরাঘুরি যতক্ষণ না সফল হচ্ছে। আমি জবাব দিলাম, মানে যতক্ষণ না সঠিক জায়গায় গিয়ে পৌঁছচ্ছি···

—কাঁটাঝোপগুলোর দিকে চলুন না। ম্যাপ তো তৈরি করেছেন, দিনের আলোয় মাপজোঁকও করেছেন, এখন রাতের আঁধারে দেখুন গিয়ে···

—ঠাট্টা করছেন নাকি বিষেণলালজী!

—না, না, ঠাট্টা করব কেন! আপনিই তো বলেছিলেন যে এমন কিছু আছে যা রাতের আঁধারেই দেখা যায়!

—ঠিকই বলেছিলাম। আমি গম্ভীর গলায় বললাম, দেখিয়ে দেব আপনাকে। একটু ধৈর্য ধরুন···

—আমার কথা শেষ হ'তে না হ'তেই উটটা ছুটতে শুরু করে।

—ও কি! বিষেণলাল ভয় পেয়ে গিয়ে বললেন, উটটা অমন ক্ষেপে উঠল কেন! যাচ্ছেই বা কোথায়?

কম্পাসের দিকে তাকিয়ে দিক নির্ণয় ক'রে আমি বললাম, মনে হচ্ছে ঐ কাঁটাঝোপগুলোর দিকেই যাচ্ছে। ওদিকে বোধ হয় কিছু দেখতে পেয়েছে···

উট যেদিকে দৌড়চ্ছে, সেদিকে একরাশ আলো দেখতে পেলাম। অন্ধকারকে চিরে ফেলে যেন তা' মরুভূমির বালি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে। ঐ আলোর দিকে ছুটে যাচ্ছে আমাদের উট।

অন্ধকার থেকে আলোর দিকে মানুষ থেকে শুরু ক'রে কীটপতঙ্গ পর্যন্ত সকলেই যেতে চায়, কাজেই আমাদের উটের ঐ আলো লক্ষ্য ক'রে ছুটে চলা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু অস্বাভাবিক তার উত্তেজনা।

ঐ আলোর দিকে একদৃষ্টে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বিষেণলাল রুদ্ধশ্বাসে বললে, ও কী ও, কিসের আলো ওটা! মনে হচ্ছে যেন বালি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে!

—বালি নয়, কাঁটাঝোপ থেকে বেরিয়ে আসছে! কাঁটাঝোপের মধ্যে আলো জ্বালল কে?

—চলুন কাছে গিয়ে দেখি···

—না না, আমি না, গেলে তুমি যাও···

আমিই গেলাম। উটটা ঐ আলোর কাছাকাছি গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। মনে হ'ল, সেও ভয় পেয়েছে।

ঐ আলোর কাছে গিয়ে দেখি, কাঁটাঝোপের প্রতিটি কাঁটাগাছ থেকে আলো বেরিয়ে আসছে। আলো অবশ্য কাঁটাগাছ বিকীর্ণ করছে না, কাঁটগাছের গায়ে লেগে থাকা ছত্রাক থেকে বিকীর্ণ হচ্ছে এই আলো।

আলো বিকীরণকারী ছত্রাকের কথা বাইরে পড়েছিলাম তাকে চোখে দেখলাম এই প্রথম। মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম আমি···

পরদিন সকালে আবার ঐ কাঁটাগাছগুলোর কাছে যাই। দিনের আলো ঐ ছত্রাক থেকে বিকীর্ণ আলোকে চাপা দিয়ে রাখলেও ছত্রাকটিকে ভাল ক'রে দেখতে পাই। ঘন সবুজ তার রঙ—কাঁটাগাছের ডালগুলির গায়ে পর্দার মত লেগে আছে।

ছত্রাকের কিছু নমুনা তুলে নিয়ে আসি। যোধপুরের ল্যাবোরেটরিতে পরীক্ষা ক'রে তার মধ্যে সীসার সন্ধান পাই। অর্থাৎ ছত্রাকটি সীসাযুক্ত। তার উৎস অবশ্য মাটির নিচে।

সীসা খুবই মূল্যবান ধাতু। সীসাযুক্ত ছত্রাক মাটির নিচে সীসার ভাণ্ডারের হদিশ দিচ্ছে। মাটির নিচে পাথরের স্তরে সীসা রয়েছে সীসাযুক্ত খনিজরূপে। জলের ক্রিয়ার পাথরের স্তর থেকে বিশ্লিষ্ট হ'য়ে মাটির সঙ্গে মিশেছে। মাটি থেকে তাকে শুষে নিয়ে এই ছত্রাক হ'য়ে উঠেছে স্বয়ংপ্রভ।

এই কাঁটাবনকে আগেই আমি মানচিত্রে চিহ্নিত করেছি, এখানে লাল দাগ দিয়ে আমি বিষেণলালকে বললাম, এখানেই আছে আপনার গুপ্তধন···

আমার আন্দাজ যে ভুল নয়, তার প্রমাণ মাস কয়েক বাদেই পাওয়া গেল। খোঁড়াখুঁড়ি ক'রে এই কাঁটাবনের তলায় সীসাযুক্ত খনিজের একটি গুপ্ত ভাণ্ডারের সন্ধান মিলল।

P-583, দমদম পার্ক, কলকাতা-55

কাঁটাঝোপ থেকে আলো বেরিয়ে আসছে।

প্রকৃতি-বিজ্ঞানী ডঃ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের পঞ্চম বার্ষিক স্মরণ সভা

সভাপতি ঃ—ডঃ জয়ন্ত বসু (সভাপতি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ)

প্রধান অতিথি ঃ—শ্রীকান্তি বিশ্বাস (মাধ্যমিক শিক্ষামন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা প্রদান করবেন ঃ—
ডঃ বিমলেন্দু মিত্র বসু বিজ্ঞান মন্দির, কলিকাতা

বিষয় ঃ—"সাময়িক পত্র, মিডিয়ার মাধ্যমে জনপ্রিয় বিজ্ঞানালোচনা ও সাধারণে বিজ্ঞান সচেতনতা।"

তারিখ—8ই এপ্রিল, 1986 · সময়—বিকাল—পাঁচটা

স্থান ঃ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700006

সর্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

উদ্যোক্তা ঃ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার সমিতি।

স্বান্তে আগষ্ট আরেনিয়াস

'স্বান্তে আগষ্ট আরেনিয়াস' রসায়ন বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে একটি সুপরিচিত নাম। রসায়ন শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী এই বিজ্ঞানী 1859 সালের 19শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সুইডেনের ভিক্ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই অঙ্ক ও পদার্থ বিজ্ঞানের প্রতি আরেনিয়াস বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। 1876 সালে স্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে তিনি উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখান থেকে স্নাতক হয়ে বেরিয়ে তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু করেন। 1881 সালে আরেনিয়াস স্টকহোমের বিজ্ঞান অ্যাকাডেমিতে বিজ্ঞানী এডল্যান্ডের অধীনে গবেষণা করতে থাকেন। এই সময় তাঁর মনে এক অভিনব প্রশ্ন জাগে। প্রশ্নটি এই রকম ঃ 'জল তড়িৎ অপরিবাহী পদার্থ'। লবণও তাই। কিন্তু জলে লবণের দ্রবণ তড়িৎ পরিবাহী'। —কেন এমন হয় ?

কালবিলম্ব না ক'রে আরেনিয়াস এ প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়ার চেষ্টায় ব্রতী হন। এই উদ্দেশ্যে আরেনিয়াস বিভিন্ন মাত্রার বিভিন্ন লবণের জলীয় দ্রবণ এক একটি ফ্লাস্কে রাখেন। প্রতিটি ফ্লাস্কের গায়ে কাগজের লেবেল লাগিয়ে দ্রবণের মাত্রা ও লবণের নাম লিখে রাখেন। তারপর এক একটি দ্রবণ নিয়ে তার মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ চালিয়ে যে ফল পান, তা লিপিবদ্ধ করে রাখেন। প্রায় পঞ্চাশ রকম লবণের জলীয় দ্রবণ নিয়ে দু' বছর ধরে নিপুণভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা করতে গিয়ে তিনি একটি সূত্র খুঁজে পান! সে দিনটা ছিল 1883 সালের 17ই মে। 1884 সালে আরেনিয়াস তাঁর গবেষণার ফলাফল সম্পর্কিত গবেষণাপত্রটি ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্যে উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করেন। গবেষণাপত্রটির নাম ছিল 'তড়িৎবিশ্লেষ্যের গ্যালভ্যানিক পরিবাহিতা বিষয়ক অনুসন্ধান।' এই গবেষণাপত্রটির জন্যে সেই বছরই আরেনিয়াস ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

এর তিন বছর পরে আরেনিয়াস যে তত্ত্বটি প্রকাশ করলেন, তা এইরকম ঃ 'যখন কোন তড়িৎ বিশ্লেষ্যকে জলে দ্রবীভূত করা হয়, তখন তা বিভিন্ন হারে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়নে বিয়োজিত হয়। পদার্থের প্রকৃতি ও তার দ্রবণের মাত্রার উপর এই বিয়োজনের হার নির্ভর করে। জলে দ্রাবের মাত্রা যত কম হয়, এই বিয়োজনের হার ততই বাড়ে। এই বিয়োজনের ফলে দ্রবণে অভিস্রবণের চাপও বৃদ্ধি পায়।

সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণটি তড়িৎ বিশ্লেষ্য। একে জলে দ্রবীভূত করলে এটি সোডিয়াম আয়ন ও ক্লোরাইড আয়নে বিয়োজিত হয়। সমকালীন বিজ্ঞানীদের অনেকেই একথা বিশ্বাস করতে পারেন নি। কিন্তু হল্যান্ডের বিজ্ঞানী 'উইলহেল্ম অস্টওয়াল্ড' কিন্তু আরোনিয়াসের তত্ত্বকে স্বাগত জানান। 'আয়নে পরিণত হওয়ার ফলে দ্রবণে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে'—আরেনিয়াসের এই তত্ত্বকে তিনি স্বীকার করেন। রিগায় তাঁর ল্যাবরেটরিতে কাজ করবার জন্যে তিনি আরেনিয়াসকে আমন্ত্রণ জানান। আরেনিয়াস সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। রিগাতে দু' বছর গবেষণা করে আরেনিয়াস তাঁর আয়ন তত্ত্বকে আরও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর আরেনিয়াস কোলরাশ, গ্রাজে, ভ্যাণ্টহয়, বোল্ডস্ম্যান প্রমুখ খ্যাতনামা রসায়ন বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পান। 1886 থেকে 1888 সালের মধ্যে আরেনিয়াসের তড়িৎ বিয়োজন তত্ত্ব পূর্ণতা লাভ করে।

অমরনাথ রায়

প্রবাসে ভারতীয় বিজ্ঞানী
গোবিন্দ্জি

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয়েস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গোবিন্দ্জি সালোকসংশ্লেষ-এর উপর মূল গবেষণা করে বিখ্যাত হয়েছেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা পদার্থবিজ্ঞানী কৃষ্ণজীর ছোট ভাই তিনি।

গোবিন্দ্জি বর্তমানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। বেশ খানিকটা ক্ষোভের সঙ্গেই তিনি বললেন, "আমি ভারতীয় বিজ্ঞানীরূপে ভারতেই থাকতে চেয়েছিলাম কিন্তু ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাঁর দেশে ফেরার শর্তাবলী মেনে নেন্নি। কিছু ভুল বোঝাবুঝির জন্যে একদা বেনারস হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে আমি যোগদান করতে পারিনি। তারপর দিল্লীর জওহরলাল বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুল অফ লাইফ সায়েন্সেস'-এর অধ্যাপকরূপে কাজে যোগ দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হয়নি।"

এখন কি আপনি দেশে ফিরে আসতে ইচ্ছুক ?—এ প্রশ্নের উত্তরে গোবিন্দ্জি বললেন, "সম্ভবতঃ নয়। তবে হ্যাঁ, দেশে আমার গবেষণার উপযোগী উন্নত মানের কোন গবেষণাগার যদি কোনদিন গড়ে ওঠে তো এ ব্যাপারে চিন্তা করে দেখতে পারি।"

আপনি কি ভারতীয় ও আমেরিকান ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন ?—একটু ভেবে নিয়ে গোবিন্দ্জি বললেন, "মেধার দিক থেকে বিচার করলে এই দুই দেশের ছাত্ররা মোটামুটি একই মানের। তবে ভারতীয় ছাত্রেরা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সাজানো, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হাতে-কলমে করা ইত্যাদি বিষয়ে কম উৎসাহী। অথচ এই গুণটি না থাকলে উঁচু দরের বিজ্ঞানী হওয়া যায় না।"

(Science Reporter-এর সৌজন্যে)

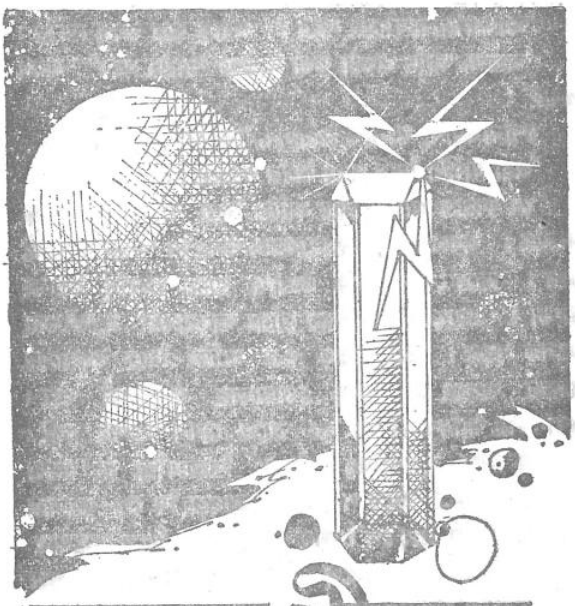

অমলথীয়ার রহস্য

নিরঞ্জন সিংহ

[দশ]

রাস্তা বন্ধ !

সমীর আর চন্দ্রনাথবাবু সেদিনের সেই টিলাটার কাছাকাছি আসতেই মিঃ চার্লসকে এগিয়ে আসতে দেখলেন। সমীর বলে উঠল, 'ওই তো মিঃ চার্লস আসছেন ; কিন্তু রবার্ট আর সাদিক তো ওঁর সঙ্গে নেই। ওরা কোথায় গেল ?'

চন্দ্রনাথবাবু কিছু বললেন না। মিঃ চার্লস ওদের দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন।

'ব্যাপার কি মিঃ চার্লস ?' প্রশ্ন করলেন চন্দ্রনাথবাবু।

মিঃ চার্লস চন্দ্রনাথবাবুর মুখের দিকে তাকালেন। চন্দ্রনাথবাবুর প্রশ্নটা ঠিক কি উদ্দেশ্য তা যেন বুঝে উঠতে পারলেন না উনি। তাড়াতাড়ি বললেন, 'ঝড়ের ধাক্কায় একটা গর্তের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলাম।'

'লাগে নি তো ?'

'না, তেমন কিছু নয়।'

'সাদিক আর রবার্ট তো আপনাকে খুঁজতে গিয়েছিল, ওরা কোথায় ?'

'ওদের সঙ্গে তো দেখা হয় নি। ওরা ফেরে নি এখনো ?' উদ্বেগ ফুটে উঠল মিঃ চার্লসের কণ্ঠস্বরে।

'না, খুব চিন্তায় পড়লাম তো। এদিকে মিঃ ব্রাডুর অবস্থাও ভাল না।' বললেন চন্দ্রনাথবাবু।

'কেন ? মিঃ ব্রাডুর কি হয়েছে ?' জানতে চাইলেন মিঃ চার্লস।

'সোনা রঙের পাহাড় দেখে ওঁর ধারনা হয়েছে পাহাড়টা সোনার। এখন প্রায় বেসামাল। যাহোক আশা করি ভয়ের কিছু নেই। কফির সঙ্গে ঘুমের বড়ি খাইয়ে দিয়ে এসেছি। একটানা কিছুক্ষণ ঘুমুলে সব ঠিক হয়ে যাবেখন। আপনি বরং উল্কায় গিয়ে বিশ্রাম নিন, নিটোভস্কী একা রয়েছে। আমি আর সমীর ওদের খুঁজে দেখি।' বলে চন্দ্রনাথবাবু এগুতেই মিঃ চার্লস বলে উঠলেন, 'আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব।'

'না, মিঃ চার্লস, আপনাকে আর আসতে হবে না, আপনি 'উল্কা'য় যান।'

'না, আমি আপনাদের সঙ্গে যাব।' মিঃ চার্লস প্রায় জিদ ধরলেন।

চন্দ্রনাথবাবু একটু কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন মিঃ চার্লসের মুখের দিকে। ওঁর মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি পাক খেতে লাগল। মিঃ চার্লসের এরকম অস্বাভাবিক জিদ ধরার কারণ কি ? একটু রুক্ষ স্বরে বলে উঠলেন উনি, 'মিঃ চার্লস, ভুলে যাবেন না এ অভিযানের নেতা আমি। আমার কথা শুনতে আপনি বাধ্য।'

'যদি বাধ্য না হই।' মিঃ চার্লসের স্বরও বিকৃত হয়ে উঠল।

'কি বলতে চান আপনি ?' গম্ভীর স্বরে বললেন চন্দ্রনাথবাবু।

'আমি আপনাদের সঙ্গে যেতে চাই।' বললেন, মিঃ চার্লস। 'আপনি অকারণে উত্তেজিত হচ্ছেন ডঃ বোস। ছেলে দুটো আমাকে খুঁজতে গিয়ে এখনো ফিরল না, তাদের খুঁজতে যাওয়া আমার একটা নৈতিক কর্তব্য।'

চন্দ্রনাথবাবু শান্ত হলেন। মিঃ চার্লসের কথা অযৌক্তিক নয়। উনি শুধু শুধু মিঃ চার্লসকে সন্দেহ করেছিলেন বলে মনে মনে একটু লজ্জা পেলেন। শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'সরি মিঃ চার্লস ! ঠিক আছে আপনি চলুন আমাদের সঙ্গে।'

সবাই এগুতে শুরু করলেন। চন্দ্রনাথবাবুর এখন একটাই চিন্তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রবার্ট আর সাদিককে খুঁজে বের করতে হবে। তারপর অমলথীয়া ছাড়তে হবে।

যে কোন সময় সবকিছু হাতের বাইরে চলে যেতে পারে। তিনজনে নিঃশব্দে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চললেন সেই সোনা রঙের পাহাড়ের দিকে।

পাহাড়ের কাছে এসেও কিন্তু সাদিক বা রবার্টের কোন খোঁজ পেল না ওরা। সমীর রবার্টের নাম ধরে ডাকতেই রবার্টের সাড়া পাওয়া গেল। চন্দ্রনাথবাবু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

রবার্ট জানালো ওরা একটা গর্তের মধ্যে রয়েছে। গর্তের নির্দেশও দিয়ে দিল। একটুখানি খোঁজাখুঁজির পরই সমীর আবিষ্কার করল গর্তটি। রবার্টের নির্দেশমত একটা বড় পাথরের সঙ্গে দড়ি বেঁধে ও ঝুলিয়ে দিল গর্তের মধ্যে। রবার্ট আর সাদিক উঠে আসতেই সমীর ওদের জড়িয়ে ধরল।

'ব্যাপার কি? হঠাৎ ওই গর্তের মধ্যে কি করে গিয়ে পড়লে তোমরা?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন চন্দ্রনাথবাবু।

রবার্ট একে একে সব কথা বলল। চন্দ্রনাথবাবু ও সমীর মিঃ চার্লসের মুখের দিকে তাকাল; কিন্তু মিঃ চার্লসের মুখে কোন ভাবান্তর লক্ষ করা গেল না। রবার্টের কথা শেষ হতেই উনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'আমি এ গর্তে পড়িনি, ওই পাশের একটা গর্তে পড়েছিলাম। তোমাদের সঙ্গে কথা বলার পর অন্ধকারে হাঁতড়ে হাঁতড়ে কোন রকমে উপরে উঠি।

চন্দ্রনাথবাবু বললেন, 'রবার্টদের সঙ্গে আপনার কথা হয়েছে সেকথা তো আগে বলেন নি মিঃ চার্লস।'

'বলিনি বুঝি? তাহলে খেয়াল ছিল না।' নির্বিকার মুখে জবাব দিলেন মিঃ চার্লস।

ইতিমধ্যে সাদিক মিঃ চার্লসকে কী একটা বলতে যাচ্ছিল; কিন্তু রবার্ট বুঝতে পেরে গোপনে ওকে ইশারা করল। সাদিক বুঝতে পেরে চেপে গেল।

রবার্ট এবার চন্দ্রনাথবাবুকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আঙ্কল, চলুন না আর একবার সবাই মিলে অমলথীয়াবাসীদের পাতালপুরীটা ভাল করে দেখে আসি।'

'বেশ চলো।' অনিচ্ছা সত্ত্বেও সায় দিলেন চন্দ্রনাথবাবু।

চন্দ্রনাথবাবুর কথা শেষ হতে না হতে রবার্ট দড়ি ধরে ঝুলে পড়ল। তারপর একে একে সবাই নামল। এমন কি সবার শেষে মিঃ চালর্স'ও নেমে পড়লেন। রবার্ট টর্চ জ্বালিয়ে সবার আগে আগে চলল। অন্য সবাই ওকে অনুসরণ করল। মিঃ চার্লস রইলেন সবার শেষে। সুড়ঙ্গের রাস্তা পেরিয়ে ওরা এসে পৌঁছুলো স্ফটিক শহরে। বাড়িগুলোর উপরে টর্চের আলো পড়তে শুরু হল সেই রঙের খেলা।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে চন্দ্রনাথবাবু দেখতে লাগলেন সেই আশ্চর্য দৃশ্য।

'কি অদ্ভুত স্ফটিকের শহর?' অনেকক্ষণ পরে প্রথম কথা বললেন চন্দ্রনাথবাবু।

'অমলথীয়াবাসীদের শহর!' অবাক হয়ে বলল সমীর।

'আঙ্কল, আমি একটা কথা বুঝতে পারছি না।' বলল রবার্ট।

চন্দ্রনাথবাবু জানতে চাইলেন, 'কি কথা?'

'এরা মাটির নিচে শহর তৈরি করেছে কেন?'

'যে কারণে আমরা চাঁদে মাটির নিচে বসবাসের ব্যবস্থা করেছি। অমলথীয়ার আবহাওয়ামণ্ডলহীন পরিবেশ খুবই চরম। দিনে যেমন প্রচণ্ড উত্তাপ, রাতে তেমনি ভয়াবহ ঠাণ্ডা। এছাড়া মাটির নিচে কৃত্রিম আবহাওয়া সৃষ্টি করা অনেক সহজ। তাই হয়ত ওরা মাটির নিচে বসবাসের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু কোথাকার অধিবাসী ওরা। এখানকার আদিবাসী যে নয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে কি ওরা বৃহস্পতির জীব? বিজ্ঞানীরা যে রহস্য এখনো ভেদ করে উঠতে পারেন নি, আমরা কি সে রহস্যের খুব কাছাকাছি এসে পৌঁছেছি?' শেষের দিকে চন্দ্রনাথবাবু যেন নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলতে লাগলেন। ওরা সবাই চুপচাপ চন্দ্রনাথবাবুর কথা শুনছিল।

'শহর অন্ধকার কেন?' প্রশ্ন করল সমীর, 'মাটির নিচে শহরে সবসময় তো আলো থাকা উচিৎ।'

চন্দ্রনাথবাবু বললেন, 'কথাটা আমিও ভাবছি। তবে রবার্টের কথা শুনে আমার একটা কথা মনে হচ্ছে...'

'কি কথা আঙ্কল?' বলল রবার্ট।

'মনে হচ্ছে আলোর ব্যবস্থা নিশ্চয় আছে, তবে কোন কারণে হয়তো এদের জেনারেটিং স্টেশনটা খারাপ হয়ে গেছে। তোমরা হঠাৎ দু'বার যে আলোর ঝলকানি দেখেছো তা খুব সম্ভবতঃ ওই বিকল জেনারেটিং স্টেশন থেকেই এসেছে। ওরা হয়তো ওটা সারাবার চেষ্টা করছে।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন আঙ্কল। এ কথাটা আমাদের মাথায় আসে নি।' রবার্ট বলল।

'এই স্ফটিকগুলো কি খুব দামী ডঃ বোস?' হঠাৎ মিঃ চার্লস এই অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসলেন। চন্দ্রনাথবাবু চার্লসের দিকে তাকালেন, কিন্তু অন্ধকারে ওঁর মুখ দেখতে পেলেন না। উনি একটু হেসে বললেন, 'আমার তো মনে হয় অমূল্য, কারণ এর সঠিক মূল্যায়ন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এগুলোকে দেখে স্ফটিক বলে মনে হলেও, আমার ধারনা এগুলো অজানা কোন ধাতু।' 'কোন ভারি মৌলিক ধাতু কি?' চন্দ্রনাথবাবুর কথা শেষ হতে না হতে প্রশ্ন করলেন মিঃ চার্লস।

মিঃ চার্লসের এই প্রশ্নে চন্দ্রনাথবাবু রীতিমত চমকে উঠলেন। মিঃ চার্লসের মুখে একথা তিনি মোটেও আশা করেন না।

'ডঃ বোস, এগুলো কি প্লাটিনাম থেকেও দামী ?' মিঃ চার্লস উত্তেজিতভাবে প্রশ্ন করে চলেছেন।

সমীররা প্রায় মিঃ চার্লসের অদ্ভুত প্রশ্নের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিল না। ওরা চন্দ্রনাথবাবুর উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছিল।

চন্দ্রনাথবাবু কিছু একটা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলেন। উনি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলেন মিঃ চার্লসও মানসিক ভারসাম্য হারাতে চলেছেন। কিন্তু কেন ? কেন মিঃ ব্রাডু মিঃ চার্লস কোন দামী ধাতু সম্পর্কে আগ্রহী ? বহু প্রশ্ন ওঁর মনে ভিড় করে আসছিল, কিন্তু এখন ওসব নিয়ে ভাববার সময় নেই। উনি খুব আস্তে আস্তে বললেন, 'আমি জানি না মিঃ চার্লস।'

রবার্ট জিজ্ঞাসা করল, 'আঙ্কল, আমরা কি এগিয়ে যাব ?'

'চলো', অন্যমনস্কের মত জবাব দিলেন চন্দ্রনাথবাবু।

রবার্ট টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে এগিয়ে চলল। সবাই ওকে অনুসরণ করল। রাস্তার দু'পাশেই অদ্ভুত ধরনের সব বাড়ি। রাস্তাটা সোজা এগিয়ে গেছে। ওই রাস্তা থেকে মাঝে মাঝে দু'একটা সরু রাস্তা বেরিয়েছে সমকোণে। ওরা নিঃশব্দে এগিয়ে চলল। রাস্তায় দেখা মিলল না কোন অমলথীয়াবাসীর। হঠাৎ ওদের ইয়ারফোনে ভেসে এলো সেই জলতরঙ্গের বাজনা। আর মুহূর্তে শহরের আলোগুলো জ্বলে উঠল। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ইয়ারফোন থেকে মিলিয়ে গেল বাজনার শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হল শহরের আলো।

'আশ্চর্য ব্যাপার !' বলে উঠল সাদিক।

কেউ কোন কথা বলল না।

সাদিক আবার উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'আঙ্কল, ধুলোর ঝড়, জলতরঙ্গের বাজনা আর এই শহরের আলোর সঙ্গে কি কোন যোগাযোগ আছে ? তিনটি ঘটনাই যেন একসাথে ঘটছে !'

চন্দ্রনাথবাবু বললেন, ঠিক বুঝতে পারছি না সাদিক।'

সাদিকের কথায় রবার্টও বলে উঠল, 'আঙ্কল, সাদিক ঠিক কথাই বলেছে। আমারও মনে হচ্ছে এই তিনটে ব্যাপারের মধ্যে কোন যোগসূত্র আছে।'

চন্দ্রনাথবাবু কিছু বলতে যাচ্ছিলেন ; কিন্তু তার আগে সাদিক বলে উঠল, 'রবার্ট টর্চটা একবার পিছনে ফেল তো।'

সাদিকের কথামত রবার্ট চট করে টর্চটা ঘুরিয়ে পিছনে আলো ফেলল আর সঙ্গে সঙ্গে সবাই চমকে উঠল। পিছনে মিঃ চার্লস নেই। অন্ধকারে পিছন থেকে কখন যে মিঃ চার্লস সরে পড়েছেন কেউ টের পায় নি। সাদিকের হঠাৎ মনে হয় যে পিছনে মিঃ চার্লস নেই তাই ও রবার্টকে পিছনে আলো ফেলতে বলে।

'কোথায় গেলেন মিঃ চার্লস ?' বললেন চন্দ্রনাথবাবু।

রবার্ট গম্ভীর স্বরে বলল, 'আঙ্কল, মিঃ চার্লস পালিয়েছেন। এবং আমার ধারণা যদি ঠিক হয় তাহলে এবারও তিনি দড়িটা নিয়ে গেছেন।'

'কি বলছিস তুই ?' সমীর অবাক হয়ে জানতে চায়।

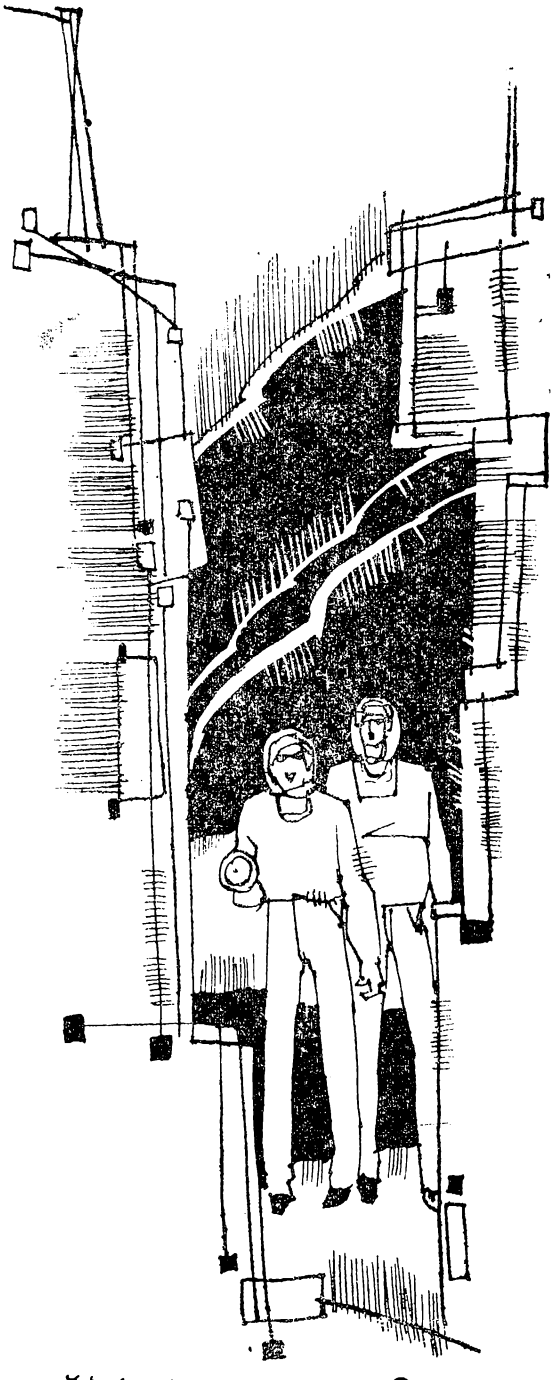

রবার্ট টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে এগিয়ে চলল।

'আমি ঠিকই বলছি সমীর। বিশ্বাস না হয়, চল নিজের চোখে দেখবি চল।' বলে রবার্ট ঘুরে আবার সেই গর্তের মুখের দিকে এগিয়ে চলল। সবাই ওকে অনুসরণ করল উৎকণ্ঠিত মনে। যেতে যেতে রবার্ট বলল, 'আঙ্কল, একটা কথা আপনাকে জানানো হয় নি। সাদিক বলতে গিয়েছিল কিন্তু মিঃ চার্লসের সামনে বলতে আমিই ওকে বারণ করেছিলাম। মিঃ চার্লসকে খুঁজতে গর্তে নেমে ওঁকে না পেয়ে আমরা যখন চলে যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছিলাম ঠিক তক্ষুণি মিঃ চার্লসের গোঙানীর শব্দ আমাদের কানে আসে। সেই শব্দ শুনে মিঃ চার্লস বিপদে পড়েছেন ভেবে ঝুঁকি নিয়েও আমরা সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকি। কিন্তু ভিতরে ওঁকে পেলাম না এবং গর্তের মধ্যে ফিরে এসে দেখলাম দড়ি উধাও। প্রথমে মনে হয়েছিল মিঃ চার্লসকে গায়েব করা এবং দড়ি উধাও করা হয়তো অমলথীয়াবাসীদের কাজ। কিন্তু যে মুহূর্তে মিঃ চার্লসকে আপনাদের সঙ্গে আসতে দেখলাম তখন আমাদের সন্দেহ হ'ল যে উনি ধোঁকা দিয়ে এই পাতালপুরীতে আমাদের ফেলে রেখে পালাতে চেয়েছিলেন। কেন তা এখনো বুঝতে পারিনি।'

'কি বলছিস তুই রবার্ট, এ যে সাংঘাতিক কথা।' সমীর প্রায় চিৎকার করে উঠল। চন্দ্রনাথবাবু আস্তে আস্তে বললেন, 'মিঃ চার্লস ও মিঃ ব্রাডু কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এই অভিযানে এসেছেন বলে এখন আমারো মনে হচ্ছে। এবং তা যদি হয় তাহলে আমাদের সমূহ বিপদ।'

'বিশেষ উদ্দেশ্য বলতে কি বলতে চাইছেন আঙ্কল?' রবার্টই প্রশ্ন করল।

'তোমরা জানো এই অভিযানটি খুবই গোপনীয়?'

'সে আমরা গোড়া থেকেই জানি।' বলল সমীর।

'কিন্তু কেন তা বোধহয় জানো না।'

'না।' বলল রবার্ট।

'তার কারণ আয়োর গবেষণাগারে বসে অমলথীয়ার বর্ণালী বিশ্লেষণ করে আমরা একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করি। আমরা বুঝতে পারি যে এই ক্ষুদে উপগ্রহে যথেষ্ট পরিমাণে ভারী মৌলিক পদার্থের সঞ্চয় আছে। আর সেই মৌলিক পদার্থ সোনা অথবা প্লাটিনাম জাতীয় কোন বস্তু হওয়া অসম্ভব নয়। আমরা বিশ্ব সরকারকে আমাদের রিপোর্ট পাঠাই। তারপরই আয়োজন করা হয় এই গোপন অভিযানের। কিন্তু ভিতরের কথা মিঃ ব্রাডু ও মিঃ চার্লসেরও জানাবার কথা নয়। অভিযানের আসল উদ্দেশ্যের কথা জানি আমি আর প্রজেক্ট ডিরেক্টর। কিন্তু এখন মিঃ ব্রাডু ও মিঃ চার্লসের ব্যবহার থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে অভিযানের আসল উদ্দেশ্যের কথা ওঁদের অজানা নয়। শুধু তাই নয় মনে হচ্ছে ওঁরা আমাদের বিপদে ফেলার চেষ্টা করেছেন।.....তাহলে প্রজেক্ট ডিরেক্টর নিজে কি এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে রয়েছেন? একথা আমি যে ভাবতেও পারছি না.....আর তা না হলে আমাকে সেন্টুর ব্যাপারে মিথ্যে কথা বলেছিলেন কেন? কেন তিনি মিঃ ব্রাডু ও মিঃ চার্লসকে এই অভিযানের জন্য মনোনীত করেছিলেন? আর কেনই বা মিঃ চার্লস ভারী মৌলিক পদার্থ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন? কেনই বা মিঃ ব্রাডু সোনারঙের পাহাড় দেখে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেন.....?' শেষের দিকের কথাগুলো চন্দ্রনাথবাবু যেন নিজের সঙ্গে বলতে লাগলেন।

ততক্ষণে সবাই গর্তের মধ্যে এসে পড়েছিল। রবার্ট টর্চের আলো ফেলল চারিদিকে। না দড়ির কোন চিহ্ন নেই। সবার মনে নেমে এল এক ভয়াবহ আতঙ্ক। এ অবস্থায় অমলথীয়াবাসীদের করুণার উপর নিজেদের ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর কোন পথ নেই। তাদের করুণা কোন পথে যাবে তাই বা কে জানে? হতাশ হয়ে সবাই মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের কথা ভাবতে লাগল। [ক্রমশঃ]

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলীর (1956)-8 ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিতহল।

1. **প্রকাশ স্থান ঃ** 86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-700009।
2. **প্রকাশ কাল ঃ** মাসিক।
3. **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ** রবীন বল, ভারতীয় নাগরিক।
4. **সম্পাদক ঃ** রবীন বল, ভারতীয় নাগরিক।
5. যে সকল ব্যক্তি এই পত্রিকার মালিক এবং যাঁরা মোট মূলধনের এক শতাংশেরও অধিক অংশীদার বা শেয়ার গ্রহীতা তাঁদের নাম ও ঠিকানা ঃ

(ক) মালিক ঃ রবীন বল, 86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা-৭।

(খ) মোট মূলধনের এক শতাংশেরও অধিক অংশীদার রবীন বল, 86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-9।

আমি রবীন বল এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(স্বাঃ) রবীন বল
প্রকাশক

অভিব্যক্তি বা বিবর্তন

দিনোজ কুমার দে

প্রঃ 1. 'জীব হইতে জীবের উৎপত্তি'—এই মতবাদটি কার ?

উঃ লুই পাস্তুরের।

প্রঃ 2. পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের সৃষ্টি হয় কোথায় ?

উঃ পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের সৃষ্টি হয় সমুদ্র জলে।

প্রঃ 3. প্রাণের-একক কি ?

উঃ প্রাণের-একক প্রোটিন অণু।

প্রঃ 4. সমসংস্থ অঙ্গ কি ?

উঃ যে সকল অঙ্গের কাজ ও আকৃতি আলাদা কিন্তু উৎপত্তিস্থল একই, তাদের বলে সমসংস্থ অঙ্গ।

প্রঃ 5. সমবৃত্তি অঙ্গ কাকে বলে ?

উঃ যে সকল অঙ্গের কাজ এক কিন্তু উৎপত্তিস্থল ভিন্ন তাদের বলে সমবৃত্তি অঙ্গ।

প্রঃ 6. সমান্তরাল বিবর্তন কি ?

উঃ প্রজাপতি, পায়রা এবং বাদুড় প্রত্যেকেই ওড়ে এবং ওড়ার জন্যে আছে ডানা। কিন্তু এই তিনটি শ্রেণীর প্রাণীর ডানার গঠন আলাদা, তাই এরা সমবৃত্তি অঙ্গ। এই সমবৃত্তি অঙ্গগুলির অভিযোজন হয়েছে আকাশে ওড়বার জন্যে। এই বিভিন্ন শ্রেণীর জীবের সমবৃত্তি অঙ্গ গুলির বিবর্তনকে বলা হয় সমান্তরাল বিবর্তন।

প্রঃ 7. নিষ্ক্রিয় অঙ্গ কাকে বলে ?

উঃ জীবদেহের যে সকল অঙ্গ পূর্বে সক্রিয় ছিল কিন্তু বর্তমানে কার্যক্ষমতা হারিয়েও জীবদেহে বর্তমান তাদের বলে নিষ্ক্রিয় অঙ্গ। যেমন মানুষের অ্যাপেনডিক্স।

প্রঃ 8. সংযোগরক্ষাকারী জীব কি ?

উঃ যে সকল জীবের মধ্যে দুটি ভিন্ন গোষ্ঠীর জীবের বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তাদের বলে সংযোগরক্ষাকারী প্রাণী। যেমন, হংসচঞ্চুর মধ্যে সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ীর বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

প্রঃ 9. অভিব্যক্তির জনক কাকে বলা হয় ?

উঃ চার্লস ডারউইনকে অভিব্যক্তির জনক বলা হয়।

প্রঃ 10. ডারউইনের মতবাদ কোন্ বিখ্যাত গ্রন্থে প্রকাশিত ?

উঃ "প্রাকৃতিক নির্বাচনের দরুণ প্রজাতির উৎপত্তি" —নামক গ্রন্থে ডারউইনের মতবাদ প্রকাশিত হয়।

প্রঃ 11. মিউটেশন তত্ত্বের প্রবক্তা কে ?

উঃ মিউটেশন তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন হুগো দ্যভ্রিস।

প্রঃ 12 ল্যামার্ক যে বইটিতে অভিব্যক্তির আধুনিক ব্যাখ্যা দেন সেই বইটির নাম কি ?

উঃ ফিলজফিক জুলজিক।

নিম্নের প্রত্যেক প্রশ্নের চারটি করে সম্ভাব্য উত্তর—দেওয়া হল। সঠিক উত্তরটি তোমরা নির্বাচন কর ঃ—

(i) অ্যানিলিডা ও আথ্রোপোডার মধ্যে সংযোগ-রক্ষাকারী প্রাণী

(a) কেঁচো। (b) জোঁক। (c) প্রজাপতি। (d) পেরিপেটাস।

(ii) "ব্যবহার ও অব্যবহারের ফলে অঙ্গের প্রকারণ ঘটে" এই প্রকল্পটি

(a) বুফনের। (b) ল্যামার্কের। (c) দ্য-ভ্রিসের। (d) ডারউইনের।

(iii) "যোগ্যতমের উদ্বর্তন"—এই মতবাদটি

(a) ডারউইনের। (b) উইলিয়াম হার্ভের। (c) স্যাকসের। (d) মিলারের।

(iv) ডারউইন যে জাহাজটি করে পৃথিবী পরিক্রমায় বেরিয়ে ছিলেন সেই জাহাজটির নাম

(a) সম্রাট। (b) সপ্তডিঙ্গা। (c) সমুদ্রকন্যা। (d) এইচ. এম. এস. বিগল।

(v) মানুষের দুটি লুপ্তপ্রায় অঙ্গ হল

(a) হৃৎপিণ্ড ও যকৃৎ। (b) যকৃৎ ও বৃক্ক। (c) উপপল্লব ও অ্যাপেনডিক্স। (d) কক্লিয়া ও কর্ণিয়া।

(vi) ঘোড়ার আদি দশা হল

(a) ইক্যুয়াস। (b) প্লিওহিপ্পাস। (c) ইওহিপ্পাস। (d) মেরিচিপ্পাস।

(vii) জীবাশ্মঘটিত বিজ্ঞানকে বলা হয়

(a) ভ্রূণবিদ্যা। (b) প্রত্নজীববিদ্যা। (c) সুপ্রজনন-বিদ্যা। (d) বাস্তুব্যবিদ্যা।

(viii) একটি জীবন্ত জীবাশ্ম হচ্ছে

(a) ইক্যুয়াস। (b) এলিফাস। (c) ডাইনোসোরাস। (d) স্ফেনোডন।

(ix) ল্যামার্কের মতবাদের বিপক্ষে সমালোচনা করেন

(a) ল্যাণ্ডস্টিলর। (b) স্যাকস্। (c) হ্যারিসন। (d) ওয়াইস্‌ম্যান।

(x) ল্যামার্কের মতবাদের পক্ষে সমালোচনা করেন

(a) ওয়াইস্‌ম্যান। (b) বেটসন। (c) ম্যাকডোগ্যাল। (d) ফ্লেমিং।

উত্তর মালা—

(i) d, (ii) b, (iii) a, (iv) d, (v) c, (vi) c, (vii) b, (viii) d, (ix) d, (x) c.

পোঃ পাইটা, বর্ধমান।

আবিষ্কারের গল্প

মৌল আবিষ্কারের পিছনে

দীপঙ্কর বসু

1982 সালের মার্চ মাসের সংখ্যায় তোমাদের জন্য 'অভিনব তাস খেলা' নাম দিয়ে ফর্মুলা তৈরি ও যোজ্যতা মনে রাখার বিষয়ে একটি লেখা লিখেছিলাম। তারপর বহুবার ইচ্ছে হয়েছে কিছু লেখার। কিন্তু সময়ের অভাবে হয়ে ওঠে নি। এবার পুজোর আগে ঠিক করলাম, পুজোর ছুটিতে তোমাদের জন্য কিছু লিখব। যে লেখা থেকে তোমরা অনেক কিছুই জানতে পারবে—জানতে পারবে—রসায়নের গোড়ার কথা। না, এবার আর কোন খেলা টেলা নয়। এবার জানবার কথা।

তোমরা সকলেই মৌল বা মৌলিক পদার্থ শব্দটা শুনেছ। মৌলিক পদার্থ হল সেইসব পদার্থ যা সব রকম ভাবে বিশ্লেষণ করা সত্ত্বেও তার থেকে ভিন্ন ধর্মের অন্য কোন নতুন পদার্থ পাওয়া যায় না।

ব্যাপারটা একটু অন্যভাবে দেখা যাক্।

রসায়ন-শাস্ত্র অর্থাৎ কেমিস্ট্রির একটা ভাষা আছে। আবার এই ভাষার একটি নিজস্ব বর্ণমালা আছে। মৌলিক পদার্থের সংকেত চিহ্নই হল তার অক্ষর। আমাদের অ, আ, ক, খ,.....যেমন অসংখ্য শব্দের জন্ম দিয়েছে, তেমনই কেমিস্ট্রির অক্ষর ও জন্ম দিয়েছে অসংখ্য রাসায়নিক যৌগিক পদার্থের। এখন পর্যন্ত নানা যৌগিক পদার্থের সংখ্যা চল্লিশ লক্ষ। আর প্রতি সপ্তাহে এই সংখ্যা ছ হাজার করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ আশ্চর্যের কথা কি জানো, কেমিস্ট্রির অক্ষর বা মৌলের সংখ্যা এখন পর্যন্ত মাত্র একশ সাতটি। আরও আশ্চর্যের কথা পৃথিবীর জীবন্ত বা জড়, যা কিছু চোখের সামনে দেখছো, সবকিছুই তৈরি এদেরই মধ্যে আশিটি মৌলিক পদার্থ দিয়ে। বাকি আর সাতাশটি মৌলিক পদার্থ মোটামুটি ভাবে পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। বিজ্ঞানীরা নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার সাহায্যে কৃত্রিম ভাবে এগুলি তৈরি করেছেন। এই একশ সাতটি মৌলের মাত্র পনেরটি ছাড়া আর বাকি সবগুলির আবিষ্কারের সময় অষ্টাদশ শতাব্দীতে কিংবা তার পরে। এই পনেরটি মৌল হল কার্বন, ফসফরাস, সালফার, আয়রন, কপার, জিংক, আর্সেনিক, সিলভার, টিন, অ্যান্টিমনি, প্ল্যাটিনাম, গোল্ড, মার্কারী, লেড, বিসমাথ। এর মধ্যে কার্বন, সালফার, আয়রন, কপার, সিলভার, টিন, গোল্ড, মার্কারী এবং লেডের কথা মানুষের প্রাচীন কাল থেকেই জানা ছিল। এসব মৌলের আবিষ্কর্তা বা বা সঠিক আবিষ্কারের সময় কিছু জানা যায় নি। মানুষের জানা প্রথম মৌলগুলিই হল এগুলি। নিশ্চয়ই, তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগছে অন্য সব মৌল থাকতে হঠাৎ এগুলির কথাই বা মানুষ প্রাচীন কালে জানতে পারল কেন? অনেকে হয়ত ভাবছো, পৃথিবীতে এগুলি বেশি পাওয়া যায়। না, এগুলির মধ্যে একমাত্র কার্বন ও আয়রনই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সালফারও মোটামুটি ভাল পরিমাণেই পাওয়া যায়। বাকি সব মৌলগুলি খুব অল্প পরিমাণেই পাওয়া যায় পৃথিবীতে। অন্যদিকে ভাবো পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় যে তিনটি মৌল অক্সিজেন, সিলিকন এবং অ্যালুমিনিয়াম তাদের কথা। মানুষ তার আবির্ভাবের প্রথম দিন থেকে প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিয়েছে, অথচ মৌল রূপে অক্সিজেনের কথা জানা গেল এই সেদিন, 1774 সালে। পৃথিবীর সবজায়গায় ছড়িয়ে আছে বালি। আর তার মূল পদার্থ হল সিলিকন ডাই অক্সাইড যা মৌল সিলিকনের যৌগ। ভাবোতো, এই সিলিকন কিনা আবিষ্কার হল 1823 সালে। প্রাচীন কাল থেকে মানুষ ক্লে (অ্যালুমিনা) ব্যবহার করছে যা কিনা আসলে মৌল অ্যালুমিনিয়ামের যৌগ। এই অ্যালুমিনিয়াম আবিষ্কারও কিন্তু বেশি দিনের কথা নয়। 1825 সালে অ্যালুমিনিয়াম মৌলরূপে আবিষ্কৃত হয়েছে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, প্রাচীন কালে আবিষ্কৃত মৌলগুলির আবিষ্কারের সঙ্গে পৃথিবীতে তাদের পরিমাণের কোন সম্পর্ক নেই। আসলে ধর্মের অনেক পার্থক্য সত্ত্বেও একটা বিষয়ে এদের মধ্যে মিল আছে। এদের প্রত্যেকটি মৌলকেই পৃথিবীতে মৌল অবস্থায় পাওয়া যায়। আর এটাই প্রাচীন কালে এদের আবিষ্কারের কারণ।

এরপর আসে জিংক, আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি, বিসমাথ ও ফসফরাসের কথা। মৌলরূপে এদের আত্মপ্রকাশ ঘটে মধ্যযুগে। এদের আবিষ্কার কিন্তু দৈবাৎ হয়েছে। মধ্যযুগে কিমিয়াবিদ্‌দের মধ্যে পরশ পাথর আবিষ্কারের জন্য যে উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছিল, তারই ফলস্বরূপ অতর্কিত ভাবে এই মৌলগুলি আবিষ্কৃত হয়েছিল। প্ল্যাটিনাম আবিষ্কারের সময় নিয়ে অবশ্য নানা রকম বিতর্ক আছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত

যেসব মৌল আবিষ্কৃত হয়েছে সেসব প্রত্যেকটির আবিষ্কারের মোটামুটি সঠিক সময় আমাদের জানা আছে। তার কারণ অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে (1) রসায়ন শাস্ত্র বিজ্ঞানের একটি স্বাধীন শাখারূপে আত্ম প্রকাশ করে এবং এই সময় থেকেই নানারকম পরীক্ষার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় যার ফলে খনিজ পদার্থের মধ্যে কোন্ পদার্থ কি পরিমাণ আছে, তা জানা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় (2) এই সময় থেকেই, রাসায়নিক মৌলিক পদার্থ কি, সে সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে ওঠে।

আচ্ছা বলতে পার, অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত বিরানব্বইটি মৌলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মৌল আবিষ্কারের কৃতিত্ব কোন দেশের ?

অনেকে হয়ত ভাবছ আমেরিকা কিংবা রাশিয়া। কেউ ভাবছ এ দুটো দেশ না হলে, ফ্রান্স, ব্রিটেন অথবা জার্মানী হতেই হবে। না, এদের কেউ নয়। এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে এগিয়ে আছে ইউরোপের ছোট একটি দেশ, যার নাম সুইডেন। মোট বাইশটি মৌল এদেশের বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন মৌলগুলি হ'ল কোবাল্ট (1735), নিকেল (1751), ক্লরিন (1771), ক্লোরিন (1774), ম্যাঙ্গানিজ (1774), বেরিয়াম (1774), মলিবডেনাম (1778), টাংস্টেন (1781), ইট্রিয়াম (1794), ট্যাণ্টালাম (1802), সেরিয়াম (1803), লিথিয়াম (1817), সেলেনিয়াম (1817), সিলিকন (1823), থোরিয়াম (1828), ভ্যানেডিয়াম (1830), ল্যান্থানাম (1839), টারবিয়াম (1843), এরবিয়াম (1843), স্ক্যানডিয়াম (1879), হলমিয়াম (1879) এবং থুলিয়াম (1879)।

আসলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সুইডেনে ধাতুবিদ্যা অত্যন্ত উন্নত ছিল। ঐ সময়ে বিভিন্ন প্রয়োজনে লোহার ব্যবহার বেশি থাকায় সুইডিশ বিজ্ঞানীদের একটি কাজ ছিল বিভিন্ন খনিজ পদার্থের মধ্যে লোহার সন্ধান করা। এই সন্ধান করতে গিয়ে বিভিন্ন খনিজ পদার্থের বিশ্লেষণের যে সকল পদ্ধতি তাঁরা বার করেন তা তাঁদের বিভিন্ন মৌল আবিষ্কারের কাজে সাহায্য করেছিল। এর পরে যে দেশটির নাম আছে, তার নাম আমাদের সকলেরই জানা। হ্যাঁ, আমি ব্রিটেনের কথাই বলছি। ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা মোটমাট কুড়িটি মৌল আবিষ্কার করেন। সেগুলো হল : হাইড্রোজেন (1766), নাইট্রোজেন (1772), অক্সিজেন (1774), স্ট্রনসিয়াম (1787), নাইওবিয়াম (1801), প্যালেডিয়াম (1803), রেডিয়াম (1804), অসমিয়াম (1804) ইরিডিয়াম (1804), সোডিয়াম (1807), পটাসিয়াম (1807), ম্যাগনেসিয়াম (1808), ক্যালসিয়াম (1808), থ্যালিয়াম (1861), আর্গন (1894), হিলিয়াম (1895), নিয়ন (1898), ক্রিপটন (1898), জেনন (1898), রেডন (1900)।

নিউম্যাটিক (Pneumatic) রসায়ন শাস্ত্রের জন্মস্থান হল ব্রিটেন। আর তার জন্যই তারা বায়ুর বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়। এই বিশ্লেষণ মৌলরূপে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, ও নাইট্রোজেনের জন্ম দেয়। এর প্রায় একশ বছর পরে ব্রিটেনেই প্রথম নিষ্ক্রিয় গ্যাসের আবিষ্কার হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ব্রিটিনে তড়িৎ রসায়ন বা ইলেক্ট্রো কেমিস্ট্রির উন্নতির জন্যই মৌলরূপে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং ক্যালসিয়াম আত্মপ্রকাশ করে। চারটি প্ল্যাটিনাম ধাতুর আবিষ্কার ব্রিটেনে হওয়ার কারণ সেই সময়ে ব্রিটেনে অনিষ্কাশিত প্ল্যাটিনামের উপর গবেষণার বৃদ্ধি। মৌল আবিষ্কারের তৃতীয় পুরস্কারটি প্রাপ্য ফ্রান্সের। এই দেশের বিজ্ঞানীরা পনেরোটি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করেন। ক্রোমিয়াম (1797), বেরিলিয়াম (1798), বোরন (1808), আয়োডিন (1811), ব্রোমিন (1826), গ্যালিয়াম (1875), সামারিয়াম (1879), গ্যাডোলিনিয়াম (1886), ডিসপ্রোসিয়াম (1886), রেডিয়াম (1898), পোলোনিয়াম (1898), অ্যাকটিনিয়াম (1899), ইউরোপিয়াম (1901), লুটেসিয়াম (1907), ফ্রানসিয়াম (1939)। আমরা সকলেই জানি, তেজস্ক্রিয়তার গবেষণা প্রথম ফ্রান্সে শুরু হয়েছিল। আর এই গবেষণাই পোলোনিয়াম, রেডিয়াম, এবং অ্যাকটিনিয়াম এই তিনটি তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থের জন্ম দেয়। জার্মানীর বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন দশটি মৌলিক পদার্থ। জারকোনিয়াম (1789), ইউরেনিয়াম (1789), টাইটেনিয়াম (1795), ক্যাডমিয়াম (1817), সিজিয়াম (1860), রুবিডিয়াম (1861), ইণ্ডিয়াম (1863), জারমেনিয়াম (1886), প্রট্যাকটিনিয়াম (1918), রেনিয়াম (1925)।

এছাড়া অষ্ট্রিনিয়ান বিজ্ঞানীরা তিনটি : টেলুরিয়াম (1782), প্রাসিওডিনিয়াম (1885), নিওভিসিয়াম (1885), ডেনমার্কের বিজ্ঞানীরা দুটি : অ্যালুমিনিয়াম (1825), হাফনিয়াম (1923), ইতালির বিজ্ঞানীরা একটি : টেক্নিসিয়াম (1937) এবং সুইজ্যারল্যাণ্ডের বিজ্ঞানীরাও একটি : ইটারবিয়াম (1878) মৌল আবিষ্কার করেন।

অনেকে হয়ত এতক্ষণ রাশিয়া ও আমেরিকার নাম না দেখে অবাক হয়েছ। অবাক হয়ো না, মৌল আবিষ্কারের খাতায় এই দুদেশেরও নাম আছে। তবে এই দুদেশের কৃতিত্ব মূলতঃ কৃত্রিম ভাবে প্রস্তুত মৌল আবিষ্কারে। রাশিয়ার আবিষ্কারের ঝুলিতে আছে ছটি মৌলিক পদার্থ। এর মধ্যে রুথেনিয়াম (1844) ছাড়া বাকি পাঁচটি মৌলিক পদার্থই কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত। এগুলি হল পারমাণবিক সংখ্যা। 102 (1963-66), কুরচা টোভিয়াম (1984),

নীলস্‌বোরিয়াম (1907), পারমাণবিক সংখ্যা 106 (1974) এবং পারমাণবিক সংখ্যা 107 (1976)।

মৌল আবিষ্কারক দেশের খাতায় আমেরিকার নাম উঠেছে বারোবার। এই বারোটি মৌলই কৃত্রিম ভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে। মৌলগুলি হল প্রমেথিয়াম (1945), অ্যাস্‌টাটিন (1940), নেপ্‌চুনিয়াম (1940), প্লুটোনিয়াম (1940), আমেরিসিয়াম (1945), কুরিয়াম (1944), বার্কলিয়াম (1950), ক্যালেফোর্নিয়াম (1950), আইনস্টাইনিয়াম (1952), ফার্মিয়াম (1952), মেণ্ডেলিভিয়াম (1955), লরেনসিয়াম (1961)।

আমেরিকার আবিষ্কৃত এই বারোটি কৃত্রিম মৌলের আটটি মৌলই আবিষ্কারের কৃতিত্ব বিজ্ঞানী জি. সিবর্গ ও তাঁর দলবলের। এর মধ্যে এ. জিওরসো দুটি মৌল তৈরিতে সিবর্গকে সহায়তা করেন। এছাড়া তাঁর পরিচালিত দলও একটি মৌল তৈরি করেন। রাশিয়ার পাঁচটি কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত মৌলের মধ্যে তিনটি তৈরি করেন জি. ফ্লেরভ ও তাঁর দলবল। বাকি দুটির জন্য কৃতিত্ব প্রাপ্য ইউ, ওগানেসিয়ান ও তাঁর দলের।

কৃত্রিম ভাবে প্রস্তুত মৌল ছাড়া বাকি মৌলদের আবিষ্কারের প্রতিযোগিতায় একক ভাবে প্রথম পুরস্কার পাবার কৃতিত্ব সুইডিশ রসায়নবিদ্‌ সি. শীলির। তিনি ছটি মৌল আবিষ্কার করেন। রৌপ্য পুরস্কার পাবার কৃতিত্ব ইংরেজ বিজ্ঞানী ডব্লিউ. রামসের। তিনি পাঁচটি মৌল আবিষ্কার করেন। চারটি মৌল আবিষ্কার করেন সুইডিশ বিজ্ঞানী জে. বার্জিলিয়াস, ইংরেজ বিজ্ঞানী এইচ্‌, ডেভি এবং ফরাসী বিজ্ঞানী পি. লেকক্‌. ডি. বয়স্‌ বাউড্যান। তিনটি মৌল আবিষ্কার করেন জার্মান বিজ্ঞানী এম. ক্লাপরথ এবং সুইডিশ বিজ্ঞানী সি. মোসানডার। দুটি করে মৌল আবিষ্কারের তালিকায় আটজন বিজ্ঞানী ও তাঁদের দলবলের নাম আছে। এই আটজনের মধ্যে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী দম্পতি মেরী কুরি ও পিয়ের কুরির নামও আছে। তোমরা অনেকেই নিশ্চয়ই হতাশ হয়েছ, মৌল আবিষ্কারক দেশের মধ্যে আমাদের দেশ ভারতবর্ষ বা তার কোন বিজ্ঞানীর নাম না দেখে। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলি। কৃত্রিম মৌলিক পদার্থ নেপ্‌চুনিয়াম এর পর থেকে যেসব মৌলিক পদার্থ কৃত্রিম ভাবে তৈরি করা হয়েছে, দেখা গেছে পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্থায়ীত্ব কমে গেছে। পারমাণবিক সংখ্যা 108 থেকে 110 এর মধ্যে যদি কোন আবিষ্কার সম্ভব হয়, তবে গণনা অনুযায়ী তা তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে যাবে। শুনে নিশ্চয়ই তোমরা আরও হতাশ হয়ে পড়ছ এই ভেবে যে, ভবিষ্যতেও আর মৌল আবিষ্কার দেশের তালিকায় আমাদের দেশের নাম তোলা যাবে না। অতি হতাশ হয়ে যেওনা। কেননা আশার কথাও আছে। জার্মান পদার্থবিদ্‌ আর. সোয়াইনে 1925 সালে বলেছেন বেশি পারমাণবিক সংখ্যার অত্যন্ত তেজস্ক্রীয় মৌলগুলির মধ্যে কিছু কিছু অতীব আশ্চর্যজনক মৌলিক পদার্থের দ্বীপ আছে। দ্বীপগুলির মৌলিক পদার্থগুলি তাদের আগের ওপরের মৌলিক পদার্থগুলি অপেক্ষা অনেক বেশি স্থায়ী। তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীরা গণনা করে এরকম কয়েকটা দ্বীপের কথা বলেছেন। এই দ্বীপগুলি পারমাণবিক সংখ্যা 114, 126, 164 এবং 184 এর কাছাকাছি। এখন পৃথিবীর বহুদেশের বিজ্ঞানীরা এই দ্বীপ ও তাদের মৌলগুলি বের করার চেষ্টা করছেন। বড় হয়ে বিজ্ঞানী হয়ে এই মৌলগুলি আবিষ্কার করব—এ রকম একটা সংকল্প নিয়ে এখন থেকে পড়াশুনা করে যাও। বলা যায় না, হয়ত তোমাদেরই মধ্যে কেউ মৌল আবিষ্কারক দেশের তালিকায় ভারতবর্ষের নাম তুলবে।

4, সরশুনা মেইন রোড, বকুলতলা, কলকাতা- 1।

ঘোষণা

আগামী সংখ্যা থেকে রঙিন পৃষ্ঠা বাড়ছে

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের বর্তমান সংখ্যা চলতি বছরের শেষ সংখ্যা। মে মাস থেকে শুরু হবে নতুন বছর। এবং নতুন বছরের শুরু থেকেই কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাতায় শুরু হবে নানা রঙিন ফিচার ও অন্যান্য আকর্ষণ। সবচেয়ে বড় খবর হলো কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের রঙিন পৃষ্ঠা সংখ্যা আরও বাড়ছে। জীবজন্তু, পোকামাকড়, গাছপালার রঙিন ছবির সঙ্গে বর্ণনাই শুধু নয়, সেই সঙ্গে যুক্ত হবে ক্যাপ্টেন স্কট, আমুণ্ডসেন প্রমুখ. অভিযাত্রীর রোমাঞ্চকর ঐতিহাসিক অভিযানের সচিত্র কাহিনী। এছাড়া অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ তো থাকছেই।—সম্পাদক

আবেদন

কাগজ, মুদ্রণ, ও আনুষঙ্গিক ব্যয় ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে। বাড়ছে প্রায় প্রতি মাসেই। তবুও আমরা দাম বাড়াইনি। আগামী বছরের প্রথম সংখ্যা থেকে পত্রিকার দাম অনন্যোপায় হয়ে 50 পয়সা বৃদ্ধি করতে হচ্ছে। আশা করি সহৃদয় পাঠক ও ক্রেতা গণ আমাদের অনুরোধ মেনে নেবেন।

সার্কুলেশন ম্যানেজার ঃ কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

প্রেমেন্দ্র মিত্রের **মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা**

চিত্রনাট্য-অনিল কর্মকার
রূপায়ণ-গৌতম কর্মকার

মাঙ্গলিকদের চেহারা জালো-মূর্তির মতো?
না।
আচ্ছা, সেই বাংলা শোনার পর একেবারে হকচকিয়ে গেছলেন, তাই না ঘনাদা?
আজগুবি ব্যাপার।
যত আজগুবিই হোক, মানেটা কি আর ঘনাদা পাননি?
হ্যাঁ, পেলাম। পেলাম নাটকের ভেতর দিয়ে। বাংলায় ওই নেপথ্য-বাণীর পরই সে নাটক যেন আপনা থেকেই শুরু হয়ে গেল।
চারপাশের দেয়ালে কয়েকটা দরজা খুলে গেল হঠাৎ। তারপর---
একি কাণ্ড বটুক, তুমি এদের সঙ্গে কী করছ? এরা কারা?
এরা বাংলা জানল কী করে? তুমি শিখিয়েছ?
না, শেখাতে এদের হয় না।
শেখাতে এদের হয় না।
38

বুঝলেন তো? এরা সব হরবোলা। যা শুনবে তা-ই নকল করতে পারে।
বুঝলেন তো? এরা সব হরবোলা। যা শুনবে তা-ই নকল করতে পারে।
বটুকের নির্দেশে এবার জামো-মূর্তিগুলো তাদের ঐ উদ্ভট পোষাকগুলো খুলে ফেলতেই যা দেখলাম--দশ দশটি মেয়ের সব কটিই যেন তিলোত্তমার ছাঁচে নিখুঁত করে ঢালা।
কাকে ছেড়ে কাকে দেখবো?
দশটিই মেয়ে? ছেলে ছিলে না?
না। শ'খানেক মাইলের মধ্যে পুরুষ তখন সংখ্যায় মাত্র জনা পনেরো। পাতালে-শহরের ছাওয়া-কল, জলকল এবং অন্যান্য সব যন্ত্রগুলো সচল রাখতে তারা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। সুরঞ্জন আর বটুককে তাই ওরা ছাড়লো না।
আর আপনি? আপনাকে যে ছেড়ে দিলে?
আমাকে? ছাড়তে কি আর চায়?
39

পৃথিবী থেকে বেশ কিছু টেকনিশিয়ান আর বিজ্ঞানী সঙ্গে করে আনবার ভরসা দিয়ে অনেক কষ্টে ছাড়া পেয়ে এখানে এসেছি।
সে কথা আর রাখতে পারেননি তো?
কী করে আর রাখবো?
প্রথমত পাতালপুরীর যে নামটা দিয়েছিলাম, সেই ধাঁধিকা থেকে সুরঞ্জনেরই স্পেসস্যুট পরে বেরিয়ে আসার মুখেই আবার সেই বুকের কষ্ট।
কেন, আপনার সেই কাঠপোড়া ছাই?
আরে তা-ই দিয়েই তো ধাক্কাটা সামলালাম।
তোমরা বোধহয় ভাবছো - ছাই দিয়ে হার্টের অসুখ কী করে সারে?
ব্যাপারটা কী জানো - আকাশপথে অনেক কাল ভারশূন্য থাকবার ফলে সকলেরই শরীর থেকে পটাসিয়াম স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশী বেরিয়ে যায়।
পটাসিয়াম কম থাকলে হার্টের প্রবাহ ক্ষুণ্ণ হয়ে হৃদযন্ত্রের ছন্দ কেটে যায়। লুটভিকের শূন্যযানে তো পটাসিয়াম ছিল না, তাই কাঠ পুড়িয়ে তা যোগাড় করতে হোল। এক কালে কাঠের ছাই থেকেই পটাসিয়াম কার্বনেট সংগ্রহ করা যেত।
40

[20 পৃষ্ঠার পর]

আর একজন মানুষ – জ্যোতির্ময় বলল, "না, পিল্লাই, ষড়যন্ত্রটা নাগেশ্বর বেশ বুদ্ধি বিবেচনা খাটিয়ে করেছিল। আমরা পোর্ট ছেড়ে আসার আগেই সে তার বিস্ফোরক-গুলো রেখে দিয়েছিল অকাশযানের ভেতর। তারপর বিস্ফোরণ ঘটার আগে লাইফবোট নিয়ে সে চম্পট দেয়। বিস্ফোরকগুলো সে এমনভাবে ব্যবহার করেছিল যাতে আমাদের আকাশযানের সামান্য ক্ষতি হতে পারে। সেই কারণে আমরা সমস্ত অভিযাত্রী কিন্তু প্রাণে মরিনি।"

পিল্লাই বলল, হ্যাঁ। অন্ততঃ আমরা তিনজন তো বেঁচে রয়েছি। তারভেতর মৃত্যু হল এগারো জনের। আমাদের তিনজনেরও মৃত্যু হতে পারত। সবাইকেই খুন করতে চেয়েছিল সে। কিন্তু যেকোন জায়গা থেকে প্রায় পঞ্চাশ আলোকবর্ষ দূরে একটা পুরনো আকাশযানকে এভাবে ধ্বংস করার মানে কী? কার কী লাভ এতে?"

এবার মুখ খুলল তৃতীয়ব্যক্তি। প্রবালকান্তি গম্ভীর গলায় বলল, "বোর্ডে রাখা ছিল লক্ষ লক্ষ টাকা দামের ইরিডিয়ম। নাগেশ্বর যদি ভেবে থাকে তা লুঠ করে নিয়ে পালাবে—তাহলে সেও হয়তো আমাদের এই জখম হয়ে যাওয়া আকাশযানের গতি আর পথ ধরে এগিয়ে আসছে।"

"তাই বুঝি?" বাঁকা সুর পিল্লাইয়ের গলায়, "সে একজায়গায় এসে ফের সেখান থেকে ফিরে যাবে কী করে? তার কাছে আছে তো মাত্র একটা লাইফবোট্। ফিরে যাওয়ার সময়ে নাগেশ্বর কোন্ পথ ধরবে কেমন গতিতে?"

জ্যোতির্ময় বলল, "ঠিক কথা। তবে আমি এখনও মনে করি নাগেশ্বর মনে মনে একটা কুমতলব এঁটেছিলই।" দুর্ঘটনায়পড়া মানুষগুলো কোনরকমে আহার শেষ করে তাকিয়ে ছিল আগুনের দিকে। মুখে তখন আর কথা ছিল না। পরিস্থিতি তাদের পক্ষে খুবই হতাশাজনক। আকাশযানের জ্বালানি তেল নিঃশেষ। যানটিও ক্ষত-বিক্ষত। অচল। তারা তিনজন যে বেঁচে রয়েছে, সেটাই এখন অবিশ্বাস্য ঘটনা!

সন্ধ্যের সময়ে হিমশীতল ঠাণ্ডা। আগুনের কাছে বসেও মালুম হয়। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটা হয়ে ওঠে ভয়াবহ।

আকাশের তারারা ঝিকমিক করছে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে গাছেরা। প্রত্যেকের মাথায় লম্বা বোঁটার ওপর একটি করে প্রস্ফুটিত পুষ্প। মুখ ফিরিয়ে রয়েছে জ্বলন্ত আগুনের দিকে অসহায় মানুষগুলোর দিকেও।

একসময় জ্যোতির্ময় বলল, "আমরা নতুনকিছু একটা করার কথা ভাবব। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।"

কথাটা সত্যি নয়! মিথ্যে বলে সাহস আর সান্ত্বনা দিতে চায় সহযাত্রীদের। এ অবস্থায় নতুন কী আর ভাববে? সামনের হিমশীতল দিন আর রাতগুলোর চিন্তাই তো এখন মগজ দখল করে রেখেছে। এই অজানা অপরিচিত গ্রহের মাটিতে আর যে কটা দিন টিঁকে থাকা যায়! তারপর নিশ্চিতভাবে মৃত্যু। হাজার বা লক্ষবছর পরে হয়তো কোন একটি কস্মোগ্রাফিক এক্সিপিডসন হবে এ গ্রহে। তখন কি আর আবিষ্কৃত হবে তাদের আকাশ-যানের মরচে ধরা ভগ্নস্তূপটি?

অভিযাত্রীরা যে যার স্লিপিংব্যাগের ভেতরে ঢুকে চেন্ টেনে বন্ধ করল। যে আগুন জ্বালা হয়েছিল সেটা নিভে আসতে লাগল একটু একটু করে। ফুলেরা সূক্ষ্মভাবে হয়ে সৃষ্টি করতে লাগল একটা অতি ক্ষীণ অধরা শব্দ। ঘুমন্ত মানুষগুলোর কাছের ফুলেরা দিল মুখ নিচু করে। এমনিভাবে প্রায় আধডজন ফুল ঝুলে থাকল জ্যোতির্ময়কে ঘিরে। তার স্লিপিংব্যাগের মাথা ছুঁয়ে রইল কোন কোন ফুল। রহস্যময় নিস্পন্দ। সকালে ঘুম ভাঙল। ফুলেরা গাছের মাথায় লম্বা বোঁটায় খাড়া হয়ে গেছে।

জ্যোতির্ময় হঠাৎ বলে উঠল, "শোনো! কাল অনেক রাত পর্যন্ত ভাবছিলাম। নাগেশ্বর এই আকাশযানে যতটা জ্বালানীতেল রেখে পালিয়েছে, তাতে প্রায় সাত আলোক-বর্ষ দূরত্বে পাড়ি দেওয়া যায়। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, আমরা আছি কোথায় কোন্ গ্রহে?"

হতাশ গলায় জবাব দিল প্রবালকান্তি, "আছি এখানে। আমৃত্যু থাকতেও হবে হয়তো?"

"নাগেশ্বরের যদি মাথা ঠিক থাকে তাহলে কোথায় থাকতে পারে সে? লাইফবোটটা নিয়েই কি এখনও মহাশূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে?"

পিল্লাই ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, "থাকলে আমাদের আকাশ-যানের ক্ষতি সে করত না এতগুলো মানুষের প্রাণ নষ্ট হ'ত না। তবে যদি সে নিজে বেঁচে থাকতে চায়—" একটু থেমে ফের বলল, "নাগেশ্বর এই গ্রহে এসেও নামতে পারে। কে জানে, হয়তো এ গ্রহের অন্য কোন জায়গাতে নেমে পড়েছেও!"

মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়ে জ্যোতির্ময় বলল, "আমি স্বপ্ন দেখেছি। এই ফুলেদের জড়িয়ে নিয়ে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন! তারা আমাকে নানাভাবে বোঝাতে চেয়েছিল নাগেশ্বর এখানে আসছেই। স্বপ্নটা বিশ্বাস করা যায়।"

ফুলেদের ওপর দিয়ে নজর ঘুরে এল জ্যোতির্ময়ের। পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ—সর্বদিকের গাছের ফুলই এ মুহূর্তে মুখ করে আছে তাদের দিকে। কী অদ্ভুত দৃশ্য! মনে একটু অস্বস্তিও জাগায়! অস্বাভাবিক ঘটনা! আকাশ জমি মিলেমিশে এক হয়ে গেছে দূরদিগন্তরেখায়। যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি পৌঁছয়, এই ফুল ছাড়া আরকিছু নেই। একই জাতের ফুল। ঘাস নেই পায়ের তলায়। মাটি নরম। আরও বিস্ময়ের ব্যাপার গাছেদের পরস্পরের মধ্যে রয়েছে প্রায় সমান দূরত্ব। যেন কঠিন শৃঙ্খলা মেনে মাপ-জোখ করে জায়গা ছেড়ে পরস্পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে গাছেরা।

পিল্লাই বলল, "জ্যোতির্ময়, এই ফুলেরা তোমাকে স্বপ্নের ভেতর দিয়ে বলেছে নাগেশ্বরও এখানে আসছে আমাদের পিছু ধাওয়া করে?" পিল্লাইয়ের চোখ ছানা-বড়া। ঝুলে পড়ে চোয়াল।

জ্যোতির্ময় বলল, "নাগেশ্বর হয়তো তার মহাশূন্যের বোম্বেটে স্যাঙাতদের বলে রেখেছিল কোথাও অপেক্ষা করে থাকতে। আমাদের আকাশযানে রয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা দামের ইরিডিয়ম। সেটা লুঠ করে নিয়ে যাওয়াই তো তাদের লক্ষ্য।"

প্রবালকান্তি বলল, "শূন্য পথে আকাশযানে কেউ দস্যুগিরি করতে পারে না। তোমাদের কাছে এখনও পর্যন্ত এ নজির নেই। কারো পক্ষে ওভারড্রাইভ করে পালিয়ে যাওয়া সহজ নয়। আকাশপুলিশের হাতে ধরা পড়ে যাবে যেকোন মুহূর্তে। তাই আমার মনে হয় নাগেশ্বর এসব দিক বিচার বিবেচনা করে এই গ্রহের কাছাকাছি এসে আমাদের যানটির ক্ষতি করে দেয়। তারপর লাইফবোট্ নিয়ে গিয়ে পৌঁছয় তার বন্ধুদের কাছে। তাদের নিজেদের একটা আকাশযান রয়েছে নিশ্চয়ই। আমাদের এই ভাঙা আকাশযান এই গ্রহের দিকে চলে আসছিল যখন, নিজেদের যানের ডিটেক্টর-স্ক্রীনের দিকে নজর রেখে বসে ছিল তারা। যাইহোক, আমরা নাগেশ্বরকে কিছুতেই ইরিডিয়ম লুঠ করতে দেবনা।"

"কী ভাবে বাধা দেবে? আমরা এখন অসহায়। কাছে কোন অস্ত্রই নেই।"

"সমস্ত ইরিডিয়ম মাটির তলায় লুকিয়ে ফেলব।"

অনেক আলোচনার পর তারা সবাই একমত। ইরিডিয়মটুকু লুকিয়ে রাখল মাটির নিচে। জ্যোতির্ময়ের মনে হল তাদের এই কাজটি যেন বেশ মজার সঙ্গে উপভোগ করল চারপাশের গাছেরা। সমস্ত ফুলের মুখ তাদের দিকেই ঘুরে রয়েছে এখনও!

কেটে গেল সারাটা দিন। কোনরকমে। অজানাগ্রহে নামল আর-এক রাত্রি।

স্লিপিংব্যাগের ভেতর ঢুকতে ঢুকতে বলল জ্যোতির্ময়, "শোনো! এখানকার এই গাছেরা আমার মনে একটা বিশেষ ধারণার সৃষ্টি করেছে। এরা দারুণ বুদ্ধি ধরে! এদের ক্ষমতাকেও বোধহয় এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দেখেশুনে মনে হয়, গ্রহ থেকে অন্যান্য সমস্ত রকম জীবনকে নিঃশেষে মুছে দিয়েছে এরাই।

তবে গাছেরা আমাদের কোনরকম অসুবিধায় ফেলেনি। আমরাও এদের জ্বালাতন করিনি অবশ্য। আমাদের ভাঙাযান আছড়ে পড়ার দরুণ কয়েকটি গাছের প্রাণ নষ্ট হয়েছে ঠিকই। তবে এটা স্রেফ দুর্ঘটনা। এতে আমাদের হাত ছিল না। গাছেরা হয়তো সেটা বুঝেছে। এখানে অন্যকোন জাতের গাছ নেই। নেই কোন জন্তু-জানোয়ার

তারা হাতের অস্ত্র নাচাতে লাগল……

কীটপতঙ্গও। আগে কখনও ছিল কিনা তাও আমরা জানি না সব গাছই পরস্পরের কাছ থেকে বেশ একটা সুনির্দিষ্ট দূরত্ব নিয়ে খাড়া, লক্ষ্য করেছো নিশ্চয়ই। গ্রহটির প্রধানতম জাতি এই গাছেরা। এদের ইন্দ্রিয় সজাগ। এরা শুনতে পায়। দেখতে পায়।"

পিল্লাই অবিশ্বাসের গলায় বলল, 'আগে এখানে কোন জীবজন্তু কীটপতঙ্গ যদি থাকে তাহলে তাদের সঙ্গে এই গাছেরা কি ফুল দিয়ে লড়াই করে জিতেছিল ?"

"কী করে লড়াই করেছিল আদিম মানুষেরা ? নির্দিষ্ট কোন পথ ছিল কি ? মানুষ ব্যবহার করেছিল তাদের মগজের শক্তি। ওই শক্তির জোরেই মানুষ আজ পৃথিবীর বুকে কর্তৃত্ব করছে। তেমনই কিছু করেছে এই গাছেরা। অন্ততঃ এই একটা গ্রহের প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন কর্তৃত্ব রয়েছে দেখা যাচ্ছে শুধু এই গাছেদেরই।"

একেবারে হাল ছেড়ে দেওয়ার মতো ভঙ্গী পিল্লাইয়ের। বলল, "যাক। তাহলে এই গাছেদের কাছে আমাদের বিপদের কথা বলো। যদি নাগেশ্বর সত্যি তার কুচক্রী স্যাঙাতদের নিয়ে এখানে এসে পৌঁছয়, তাহলে এই গাছেরা সবাই মিলে যেন জব্দ করে দেয় তাদের।"

বাকিটুকু বলল প্রবালকান্তি, 'আর, বোম্বেটেদের আকাশযান ছিনিয়ে নিয়ে তাতে যেন তুলে দেয় আমাদের তিনবন্ধুকে। গাছেদের বলো, আমরা নির্বিঘ্নে পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে তোমাদের চিরকাল কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবো।"

বলে হেসে উঠল হেঁ হেঁ করে। ওই সঙ্গে পিল্লাইয়ের হাসিও যোগ হ'ল। অবিশ্বাসী দুইবন্ধুর মুখের দিকে একটু বোকার মতো তাকিয়ে রইল জ্যোতির্ময়। শেষে অটল বিশ্বাস নিয়েই ফের বলল সে, 'আমি গাছেদের সঙ্গে কথা বলব।"

নির্বিঘ্নে কেটে গেল রাত। এল আর-একটা নতুন দিন। তিনি স্পেশম্যানের মনে ক্রমে একটা ধারনা জন্ম নিতে লাগল। হয়তো নাগেশ্বর আর এল না! তার ডিটেক্টর স্ক্রীন অকেজো আকাশযানের উল্টো-পাল্টা গতির হদিস তাকে দিতে পারেনি সঠিকভাবে।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতির্ময় লক্ষ্য করল, হাজার হাজার ফুলের ভঙ্গীর মধ্যে স্পষ্টভাবে একটা পরিবর্তন হয়ে গেছে। বিগত দুদিন যেটা চোখে পড়েনি। তারপরই কানে এল দূর থেকে ভেসে আসা একটা চাপা যান্ত্রিক গর্জন। অতি দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছিল সেটা। হঠাৎ বজ্র-ধ্বনির মতো কানে এল! একটা ছোট আকারের আকাশযানকে মাথার ওপরে অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে সোজা নেমে আসতে দেখা গেল শিকারী পাখির মতো। সেটার লক্ষ্য ভেঙেপড়া আকাশযানটি।

কিন্তু ওভাবে নামলে তো অনেক গাছের জীবন নষ্ট হয়ে যাবে! কথাটা জ্যোতির্ময়ের মনে উঁকি দিল চকিতের জন্যে। উৎকণ্ঠিত জ্যোতির্ময় দৌড়ে গেল তাদের ভেঙেপড়া আকাশযানের তৈরি নালার দিকে। ওখানে তো আগেই কিছু গাছের জীবন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। নতুন করে আর ক্ষতি হবে না। জ্যোতির্ময় চায় ঠিক ওই জায়গাতে নামুক আকাশযানটা। জায়গাটাকে হাতের ইসারায় দেখাতে লাগল সে। বার বার।

কিন্তু জ্যোতির্ময়ের ঐকান্তিক চেষ্টা সফল হল না। তার ওপর মারাত্মক অস্ত্রের মুখ বেরিয়ে এল নবাগত যানের গায়ের গর্ত থেকে। অকারণে একবার উগরিয়ে দিল কয়েক ঝলক আগুন। তাতে ধ্বংস হয়ে গেল বিস্তীর্ণ এলাকার গাছ! কারা ওরা, নাগেশ্বরের দল না আর কেউ ? সত্যি কি তাহলে মহাকাশের বোম্বেটেদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে নাগেশ্বর ?

জ্যোতির্ময়ের কানে ধরা পড়ল এক বিস্ময়জাগানো অস্বাভাবিক সুতীক্ষ্ম আওয়াজ! গাছেরাই কি ভয় পেয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে আওয়াজটা ছড়িয়ে দিতে লাগল এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত ? এটা কীসের ইঙ্গিত ?

পোড়ামাটির ওপরে ধীরে ধীরে নামল আকাশযানটি। যাত্রীরা তা' থেকে নেমে আসার আগে তাদের অস্ত্র অগ্ন্যুদ্গার করল ফের। পুড়ে ধ্বংস হল আরও কিছু গাছের জীবন।

স্পেশস্যুট পড়া অস্ত্রধারীদের নেমে আসতে দেখে প্রথম এগিয়ে গেল জ্যোতির্ময়ই। স্পেশহেলমেট পরা প্রথম ব্যক্তিকে চেনা গেল না। তবে দ্বিতীয়ব্যক্তি খোদ্ নাগেশ্বরই।

তাকে দেখে মনের রাগ চেপে দাঁতে দাঁত পিষে বলল জ্যোতির্ময়, "আমরা মাত্র তিনজন বেঁচে গেছি, নাগেশ্বর।"

ধমকের সুরে নাগেশ্বর শুধাল, "ইরিডিয়ম—?"

"সেটাও আছে। লুকিয়ে রেখেছি।"

নাগেশ্বরের হাতের মারণাস্ত্রের মুখ নত হল, "লুকিয়ে রেখেছো কেন ?"

"তোমার সঙ্গে একটু দর কষাকষি করতে চাই।" প্রায় অকম্পিত গলায় বলতে লাগল জ্যোতির্ময়, "তোমাকে সত্যিকথাটাই বলছি। আমরা আগে এমন কোন জায়গায় পৌঁছতে চাই, যেখানে থেকে উদ্ধার পাবার সম্ভাবনা রয়েছে যথেষ্ট। তুমি আমাদের তিনজনকে নিয়ে সেখানে পৌঁছে দেবে প্রতিজ্ঞা করো। ইরিডিয়ম কোথায় আছে তারপর আমরা তোমাকে বলে দেব। তা নাহলে তোমাকে নিজেই খুজে বের করে নিতে হবে সেটা।"

নাগেশ্বরের সঙ্গীরা জ্যোতির্ময়দের দেখে বুঝে নিয়েছিল এই গ্রহে পা রাখতে হলে স্পেশস্যুটের দরকার নেই। তাই হুড়োহুড়ি করে বেরিয়ে এল তারা তাদের আকাশযান থেকে। নাগেশ্বরকে নিয়ে দলে তারা পাঁচজন।

জ্যোতির্ময়দের ভাঙা যানের ভেতরে যত রসদ ছিল তখনও, সেসবই লুঠ করে তুলে নিল তারা নিজেদের যানের ভেতর।

এসব দেখতে দেখতে পিল্লাই নিচুগলায় বলল জ্যোতির্ময়কে, "ইরিডিয়ম লুকিয়ে রাখার আর কোন মানে হয় না।"

জ্যোতির্ময় বলল, "নাগেশ্বর, এসো জায়গাটা তোমাদের দেখিয়ে দিই।"

ক্রুরহাসি নাগেশ্বরের মুখে। বলল, "তোমরা নিজেরা সেটা বের করে আমার হাতে দাও।" তার হাতের অস্ত্র নাচতে লাগল জ্যোতির্ময়ের চোখের সমান।

লুকোনো জায়গা থেকে ইরিডিয়মটুকু বের করে দিলে জ্যোতির্ময়রা। নিজের সঙ্গীরা আকাশযান থেকে নেমে এসে নাগেশ্বরকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল তখন। তারপরই ঘটল এক অবিশ্বাস্য অত্যদ্ভুত ঘটনা! ইরিডিয়ামের পাত্র হাতে নিয়েই সঙ্গে সঙ্গে যেন অদৃশ্য কোন মন্ত্রবলে পাথর হয়ে গেল নাগেশ্বর। আর নড়াচড়া নেই। নিঃশ্বাস পড়ে না। চোখের পাতা স্থির, দেখতে দেখতে একই অবস্থা হয়ে গেল তার সঙ্গীদেরও! ঝড় নেই। তবু একটা ঝড়ের-মতো গোঁ গোঁ শোঁ শোঁ আওয়াজ ছড়িয়ে পড়তে লাগল দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত!

এ রকম একটা অচিন্ত্যনীয় ঘটনা দেখে জ্যোতির্ময়ের সঙ্গীরা প্রায় হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। তবে জ্যোতির্ময়ের স্বাভাবিক বুদ্ধি থাকে অটুট! বোম্বেটে যানের ভেতরে এখন আর কেউ নেই। জ্যোতির্ময় চটপট ইরিডিয়মের পাত্র ছিনিয়ে নিল নিষ্প্রাণ প্রস্তরবৎ নাগেশ্বরের কাছ থেকে। তারপর পিল্লাই আর প্রবালকান্তিকে চোখের ইসারা করে বোম্বেটে যানে উঠে পড়তে বলল। তাদের পেছনে পেছনে গিয়ে উঠল জ্যোতির্ময় নিজে।

ভূমি ছেড়ে খাড়াভাবে ওপর দিকে উঠতে লাগল আকাশযানটি।

জ্যোতির্ময় বলল, 'আমি আগেই তোমাদের বলেছিলাম ওই গ্রহে পূর্ণমাত্রায় কর্তৃত্ব করছে ওই গাছেরা। তারা মানুষের মতোই বুদ্ধি ধরে। নিজের বুদ্ধিমত কাজ করে মানুষ। কিন্তু গাছের তো হাত-পা নেই। তারা কাজ করে অন্যভাবে। যেমন, সমস্ত প্রাণীকে তারা তাদের কাছ থেকে দূরে থাকতে বলে। খাটায় সম্মোহণ বিদ্যার মতো একটা শক্তি। একটা একটা করে আলাদাভাবে ধরলে প্রতিটি গাছের তেমন শক্তি অতি অল্পই। কোন জিনিসকে বা কাউকে সম্মোহিত করতে পারে না। কিন্তু যখন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ গাছ মিলে এক যোগে প্রয়োগ করে ওই ক্ষমতা, তখন সেটাকে উপেক্ষা করা বা সেটার অবাধ্য হয়ে ওঠা যে সুকঠিন ব্যাপার আমরা প্রত্যক্ষভাবে তা উপলব্ধি করেছি। গাছেদের অদৃশ্য নির্দেশেই এই আকাশ যানে উঠেছি আমরা। নাগেশ্বরদের জব্দ করে দিয়েছে। প্রাণীরা অতীতে তাদের উপকারে লাগত। অন্যজাতের উদ্ভিদদের নিঃশেষে খতম করতে তারা সাহায্য পেয়েছিল উদ্ভিদভোজী প্রাণীদের। পরে বুঝেছিল নিজেদের বিপদের সম্ভাবনার কথাটাও। তাই নিজ জাতের গাছেরা যখন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় ঝাড়ে বংশে বেড়ে উঠল, তখনই মনে করল তারা, আর কোন জাতের প্রাণীর প্রয়োজন নেই তাদের।

'গাছেদের আমরা বিরক্ত করিনি। শত্রুতা তো নয়ই। গাছেরা বুঝতে পেরেছিল আমাদের মনের কথা। নিশ্চয়ই খুন করতে পারত আমাদের। নাগেশ্বরদের মতো নিষ্প্রাণ পাথর করে দিতে পারত। তাই বলছি, তাদের করুণার ওপরে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে থাকতে হয়েছিল আমাদের। পিল্লাই! কথাটা মনে এলে বড়ই অস্বস্তি হয়। আমাদের বুদ্ধি দিয়ে যেটুকু বোঝা যায় তা' হ'ল, ওই গ্রহের ঢুকে আমাদের উপস্থিত হওয়াটা যে নিছক এক দুর্ঘটনা, গাছেরা সেটা বুঝতে পেরেছিল। তারা একথাও বুঝেছিল আমরা শিকার হয়েছিলাম আমাদের স্বজাতিরই। নাগেশ্বর সদলে এসে অসংখ্য গাছ পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু গাছেদের আমরা রক্ষা করতে চেয়েছিলাম। যাই হোক, গাছেরা তাদের নিজ নিজ বুদ্ধিমতো লড়ে গেছে। আমাদের মনের কথা পড়ে নিয়েছিল তারা। নাগেশ্বররা ওখানে ছিল গাছ এবং আমাদের উভয় পক্ষেরই শত্রু। আমাদের আইডিয়ার সঙ্গে গাছেরা সঠিকভাবে যোগসাজস রক্ষা করতে পারছিল না। শুধু হুকুম দিয়ে গেছে। যখন ঘুমিয়ে থাকতাম, আমি শুনেছি।'

পিল্লাই কৌতুকের সুরে বলল, 'তুমি স্বপ্নে এসব কথা শুনেছিলে? সত্যি?'

'কে স্বপ্ন দেখছে এখন?' জ্যোতির্ময় হাসি হাসি মুখে বলল, 'আমরা পৃথিবী অভিমুখে চলেছি। এটা বাস্তব ঘটনা। পৃথিবী থেকে এই আকাশের দূরত্ব এখন পঞ্চাশ আলোকবর্ষ দূরে।'

ধর্মতলা রোড, সালকিয়া, হাওড়া।

গত 1984 সালের 28শে জুলাই থেকে শুরু হয়েছিল লস এঞ্জেলেস অলিম্পিকে বিশ্বের দ্রুততম বা সর্বাপেক্ষা শক্তিমান মানুষ বাছাই করার প্রতিযোগিতা। অলিম্পিকে যোগদানের অধিকার শুধু মানুষের। যদি মানুষ ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য অধিবাসীরাও এতে যোগদান করতে পারত, তবে অলিম্পিকের সব গৌরবই ম্লান হয়ে যেত!

বিশদভাবে পরীক্ষা করে দেখা যাক্। জিম হাইন্স প্রমুখ বিশ্বের সেরা স্প্রিণ্টাররা 100 মিটার দৌড়েছেন 9·95 সেকেণ্ডে - গড়ে ঘণ্টায় 36 কিলোমিটার। জীবজগতের স্প্রিণ্ট চ্যাম্পিয়ন চিতা কিন্তু ঘণ্টায় 65 থেকে 70 মাইল বেগে ছুটতে পারে—100 মিটার দৌড়াতে তার 4 সেকেণ্ডের বেশী লাগবে না। চিতা কিন্তু তার গতিবেগ 300/400 মিটারের বেশী রাখতে পারে না। আরও দূর পাল্লার দৌড়ে চ্যাম্পিয়ন আমেরিকার প্রংহর্ণ অ্যান্টিলোপ। তারা এক মাইল পর্যন্ত ঘণ্টায় 42 মাইল বেগে দৌড়াতে পারে। 1500 মিটার দৌড়াতে প্রংহর্ণের লাগবে মাত্র 1 মিনিট 20 সেকেণ্ড—যেখানে আমাদের বিশ্ব রেকর্ড 3 মিনিট 29·7 সেকেণ্ড।

সাঁতারে মার্ক স্পিৎজ 100 মিটার পেরিয়েছেন 50 সেকেণ্ডের সামান্য কমে—গড় গতিবেগ ঘণ্টায় $4\frac{1}{2}$ মাইল। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন সাঁতারু ক্যালিফোর্ণিয়ার সী-লায়ন—তার সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় 25 মাইল। পাখীদের মধ্যে জেণ্টু পেঙ্গুইন ঘণ্টায় 22·4 মাইল সাঁতরাতে পারে। আর মাছেদের তো কথাই নেই। ফ্লোরিডার সেল-ফিশের (sail-fish) গতিবেগ মাপা হয়েছে ঘণ্টায় 68·1 মাইল। তলোয়ার মাছও (sword-fish) খুব জোরে যেতে পারে। তার সর্বোচ্চ বেগ হিসাব করা হয়েছে ঘণ্টায় 57·6 মাইল। তার ডাইভিং? অলিম্পিক ডাইভিং প্রতিযোগিতার বিচার হয় শূন্যে কলাকৌশলের উপর কিন্তু জলের তলায় মানুষের অনেক কিছু শেখার আছে। ওয়েডেল সীল (weddle seal) সমুদ্রগর্ভে 1968 ফুট পর্যন্ত ডুব দিয়েছে আর জলের তলায় থেকেছে 43 মিনিট 20 সেকেণ্ড। 1969 সালে একটি তিমি (sperm whale) ডার্বানোর কাছে 1 ঘণ্টা 52 মিনিট ডুব দিয়েছিল এবং প্রায় 10,000 ফুট সমুদ্রগর্ভে গিয়েছিল বলে মনে করা হচ্ছে। কোনো মানুষের এরকম দম আছে? ব্রোটুলিড পরিবারের মাছরা অবশ্য 27,000 থেকে 30,000 ফুট গভীরতায় বাস করে।

আজ পর্যন্ত অলিম্পিকে কেউ ওড়ার কৌশল দেখাতে পারেননি কিন্তু প্রাণিজগতের তাও করায়ত্ত। স্তন্যপায়ী প্রাণিদের মধ্যে সবচেয়ে জোরে ওড়ার ক্ষমতা গুয়ানো

বাদুড়

বাদুড়ের (Guano bat) ঘণ্টায় 32 মাইল। ওড়ার গতিবেগে সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে এক ধরনের নাকুটি পাখি (spine-tailed swift)—তার সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় 106·1 মাইল পর্যন্ত রাশিয়ায় মাপা হয়েছে। অবশ্য ছোঁ মারার সময়ে এক ধরনের বাজপাখির (Peregiure falcan) গতিবেগ ঘণ্টায় 185 মাইল পর্যন্ত উঠতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা হিসাব করেছেন। পোকামাকড়দের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগামী এক ধরনের ঘোড়ামাছি (Deer bot Fly) —তার সর্বোচ্চ গতিবেগ প্রায় ঘণ্টায় 36 মাইল। শারীরিক আয়তনের সঙ্গে তুলনা করলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে! যে সময়ে TU-104 জেট বিমান (গড় গতিবেগ ঘন্টায় 900 কিলোমিটার) তার নিজের দৈর্ঘ্যের 1500 গুণ যায়, সেই সময়েই একটি পায়রা যাবে তার দৈর্ঘ্যের 5,000 গুণ, মৌমাছি 10,000 গুণ আর ঘোড়ামাছি প্রায় 30,000 গুণ। পোকাদের শারীরিক ক্ষমতাও অসাধারণ! বেশির ভাগ পাখি ডানা ঝাপটায় মিনিটে 240 থেকে 360 বার, ছোট্ট হামিংবার্ড মিনিটে 5,400 বার, মৌমাছি মিনিটে 14,000 বার আর মিজ (midge) পোকা মিনিটে 62,760 বার। একবার পেশী সঙ্কোচন-প্রসারণে মিজ পোকার লাগে মাত্র 0·00045 সেকেণ্ড। প্রাণিজগতে এত দ্রুত পেশী সঞ্চালনের ক্ষমতা কারও নেই।

মেক্সিকো অলিম্পিকের বিস্ময়-বালক বব বীমন 29 ফুট $2\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লাফিয়েছিলেন। দীর্ঘ-লম্ফনের এই রেকর্ড

কোনো মানুষ আজ পর্যন্ত ছুঁতে পারেনি কিন্তু দু-এক ধরনের হরিণ ও পাহাড়ী ছাগল লংজাম্প ও হাইজাম্পের চ্যাম্পিয়ন। লাল ক্যাঙারুর লংজাম্পে 42 ফুট আর হাই-জাম্পে $10\frac{1}{2}$ ফুট পেরিয়ে যাবার পরীক্ষিত নজর আছে। নজির আছে। মানুষ কি কোনদিন এ রেকর্ড ছুঁতে পারবে? এমনকি যে ব্যাঙকে নিকৃষ্ট জীব মনে করা হয় তারই একজ্ঞাতি দক্ষিণ আফ্রিকায় 1954 সালে এক লাফে 32 ফুট পেরিয়েছে। আকৃতিগত তুলনায় এখানেও শ্রেষ্ঠত্ব পোকাদের। মাত্র 0·47 ইঞ্চি লম্বা একটি পোকা (Click Beetle) সরাসরি $11\frac{3}{4}$ ইঞ্চি লাফাতে পারে। একটি লাফানো মাছি (Jumping Flea) লং জাম্পে 13

লাল ক্যাঙারু

ইঞ্চি ও হাই জাম্পে $7\frac{3}{4}$ ইঞ্চি পেরিয়ে যেতে পারে। মানুষের সঙ্গে আকৃতিগত তুলনায় এ দুটি লাফ দাঁড়াবে 700 ফুট ও উচ্চতায় 450 ফুট।

বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ রাশিয়ার ভ্যাসিলি অ্যালেক্সিয়েভ মন্ট্রিলে সুপার-হেভী ওয়েটে ভারোত্তোলন চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। 112 কেজি ওজনের অ্যালেক্সিয়েভ জার্কে তুলেছিলেন 560 পাউন্ড নিজের ওজনের আড়াই গুণ। প্রাণিজগতে শক্তিমাপার পদ্ধতি নানারকমের। কেবলমাত্র বানরজাতীয় প্রাণীর পক্ষেই ওজন তোলা সম্ভব। 100 পাউন্ড ওজনের একটি শিম্পাঞ্জী মাথার উপরে 600 পাউন্ড ওজন অনায়াসে তুলতে পারে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে প্রশিক্ষণ পেলে গরিলার পক্ষে 1800 পাউন্ড পর্যন্ত ওজন তোলা সম্ভব। অন্য এক পদ্ধতিতে ডায়নামোমিটার যন্ত্রে সুজেৎ নামে একটি শিম্পাঞ্জীর এক হাতে টানার ক্ষমতা মাপা হয়েছে 1,260 পাউন্ড যেখানে প্রমাণ আকারের কোনও মানুষের পক্ষে 250 পাউন্ডের বেশি টান দেওয়া সম্ভব নয়। সাধারণতঃ হাতিকে স্থলচর প্রাণিদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী মনে করা হয়। কিন্তু দেখা গেছে 5/6 টন ওজনের হাতি 6 থেকে 8টন ওজনের গাছের গুঁড়ি টেনে নিয়ে যেতে পারে। সেখানে এক জোড়া ক্লাইডসডেল ঘোড়া (যাদের এক-একটির ওজন 1800 পাউন্ড) 1893 সালে একটি স্লেজে 143·9 টন ওজনের গাছের গুঁড়ি বয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

প্রাণিজগতে আকারের বৈষম্য বিরাট। অলিম্পিকে লাইট-ফ্লাই ওয়েট থেকে সুপার-হেভী ওয়েটের গণ্ডীতে 48 কেজি থেকে 110 কেজি ওজনের মানুষকে ভাগ করা হয়। আর প্রাণিজগতে সবচেয়ে ছোট পোকার ওজন 0·005 মিলিগ্রাম আর নীল তিমির প্রায় দুশো টন। তাই তাদের তুলনাও কঠিন। নীল তিমি ঘণ্টায় 23 মাইল বেগে সাঁতার কেটে 520 অশ্বশক্তি ব্যয় করে না বটে কিন্তু প্রতি গ্রাম ওজনে এক ঘণ্টায় তার শক্তি ক্ষয় হয় 13·7 ক্যালরি। অ্যালেক্সিয়েভ যেখানে নিজের ওজনের আড়াই গুণ ওজন তুলেই কাত, সেখানে মৌমাছিরা 15 গুণ ভার তুলতে পারে, ম্যান্টিস (mantis) জাতীয় ফড়িংরা 24 গুণ, শস্য-সংগ্রহকারী পিঁপড়েরা 52 গুণ এবং একজাতীয় গুবরে পোকা 850 গুণ। এর পরেও মানুষকে বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলবো?

মার্ক টোয়েনের সরস ভাষায় ক্যালাভেরাস কাউন্টিতে লাফানে ব্যাঙের লং-জাম্প প্রতিযোগিতার কথা আছে। ঐ রকম একটা প্রতিযোগিতার টিকিট যদি পাওয়া যায়, টিভি-তে দেখা লস এঞ্জেলেস কোথায় লাগে।

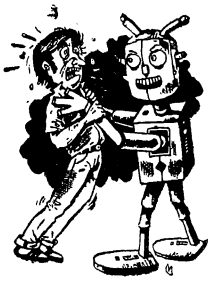

বিজ্ঞান সংবাদ

ভূমির ব্যবহার ও সমীক্ষা

মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ কর্তৃক নির্ধারিত ভূগোলের নতুন সিলেবাস অনুসারে কলেজ স্ট্রীটের ভগবতী বালিকা বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে গত 23শে ফেব্রুয়ারী, 1986তে হাওড়া জেলার বাগনান থানার অন্তর্ভুক্ত টেপুর নবাসন মৌজায় ভূমির ব্যবহার এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই সমীক্ষা শিবিরে কলকাতা থেকে ভগবতী বালিকা বিদ্যালয় ও লী মেমোরিয়াল গার্লস হাই স্কুল এবং হাওড়া থেকে বেলুড় গার্লস হাই স্কুল ও আনন্দ নিকেতনের প্রায় একশ পঞ্চাশ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশ গ্রহণ করে। সমীক্ষার কাজে সাহায্য করেন ভগবতী বালিকা বিদ্যালয়, লীমেমোরিয়াল, বেলুড় গার্লস এবং বয়েজ, আনন্দ নিকেতনের প্রধান ও সহশিক্ষক শিক্ষিকারা, প্রেসিডেন্সী এবং লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজের ভূগোল অনার্সের দুজন ছাত্র-ছাত্রী। সমস্ত বিষয়টি পরিচালনা করেন কলকাতার পার্ক ইনসটিটিউশনের ভূগোল শিক্ষক শ্রী কালিদাস চন্দ। স্থানীয় অধিবাসীগণও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

রাজ্য ছাত্র যুব উৎসব ঃ বহরমপুর

গত 1—5ই ফেব্রুয়ারী বহরমপুর ব্যারাক স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত হল চতুর্থ রাজ্য ছাত্র যুব উৎসব। এই উৎসবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল বিজ্ঞান প্রদর্শনী। গর্বের কথা মুর্শিদাবাদ জেলার অগ্রণী বিজ্ঞান সংগঠন মুর্শিদাবাদ জিলা বিজ্ঞান পরিষদ তাদের সভ্য-সভ্যাদের নিয়ে দারুণ আকর্ষণীয় সব প্রদর্শনী করেছিলেন।

পরিষদ মূলতঃ তিনটি ভাগে তাদের প্রদর্শনীকে ভাগ করে নিয়েছিলেন। বিজ্ঞান মডেল এই পর্যায়ে বিভিন্ন যান্ত্রিক ইলেকট্রনিক্স মডেলের মাধ্যমে তাঁরা প্রমাণ করেছেন এই প্রজন্মের খুব শীঘ্র একদল বিজ্ঞান কর্মী উপহার দিচ্ছেন যাঁরা বিজ্ঞানকে সাধারণের মধ্যে নিয়ে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। 'কুসংস্কার ঃ ধর্মীয় ভণ্ডামি' শীর্ষক প্রদর্শনীটি চিত্তাকর্ষক ছিল।

বিজ্ঞান প্রদর্শনী

সম্প্রতি নগর আজিজা স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ের 40 বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে চারদিন ব্যাপী এক উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই উৎসবে জেলার অগ্রণী বিজ্ঞান ক্লাব হিসাবে মুর্শিদাবাদ জিলা বিজ্ঞান পরিষদকে আমন্ত্রণ জানান হয়। পরিষদ এই উৎসবে ধর্মীয় কুসংস্কারের নামে ভণ্ডামি' এবং 'ভূপাল আর নয়' শীর্ষক দুইটি মডেলসহ প্রদর্শনী ছাড়া বেশ কিছু বিজ্ঞান বিষয়ক মডেল যা গ্রামের মানুষদের দারুণভাবে বিজ্ঞান সচেতন করে তোলার পক্ষে উপযোগী প্রদর্শন করান। এই প্রদর্শনীতে যোগদান করেন শ্রী পার্থ মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সৈয়দ রিয়াজ কাদির, মানস কর্মকার, অভিজিৎ শিকদার।

পরিষদের মুখপাত্র ডঃ মিহির কুমার দত্ত জানালেন এই উৎসবে 'ভূপাল আর নয়' শীর্ষক পোষ্টার প্রদর্শনী এবং কুসংস্কার নিয়ে হাতে কলমে প্রমাণ দারুণভাবে প্রশংসিত হয়।

"নীম" "হ্যাঁ" অথবা "না" ক্যুইজ প্রতিযোগিতা

ছোটদের জন্য সম্পূর্ণ অভিনব একটি ক্যুইজ প্রতিযোগতা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল গত 23 জানুয়ারি রবীন্দ্র সরোবরের মুক্ত মঞ্চে।

নেতাজী কি কলকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন? মাছেরা কি ঘুমোয়? টমেটো কি ফল? এই ছিল প্রশ্নের নমুনা। উত্তর দিতে হবে এককথায়, 'হ্যাঁ' অথবা না। 8—13 বছরের বয়সের প্রায় 1000 ছেলেমেয়ে এতে অংশ গ্রহণ করে। উত্তর দিতে পারলেই পুরস্কার। না পারলে বাতিল। শেষ পর্যন্ত পৃথ্বীরাজ থাপা নামে একটি মাত্র ছেলে সব কটি প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হয়। একা তাকেই 'নীম সুপার ক্যুইজ ফিড' 10,000 টাকার পুরস্কার অর্পণ করা হয়।

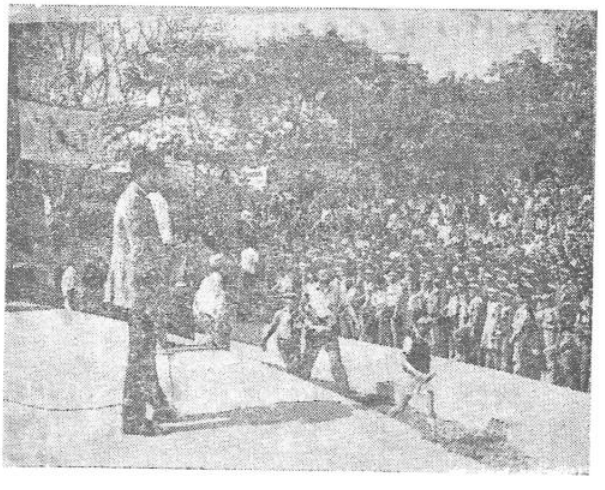

এ ছাড়া একটি পোর্টেবেল টিভি, ট্রানজিস্টর রেডিও বাইসিকেল প্রভৃতি আগে জেতা পুরস্কার তো আছেই। বারো বছরের পৃথ্বীরাজ জুলিয়ান ডে স্কুলের ছাত্র। এবং এটাই তার ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় প্রথম যোগদান।

বিচিত্র গাছপালা

অরবিন্দ ঘোষ

কৃষ্ণ বট

কৃষ্ণবটের ইংরেজী নাম বাটারকাপ বেনিয়ান এবং বৈজ্ঞানিক নাম—ফাইকাস· কৃষ্ণা। মোরেসী পরিবারভুক্ত ভারতীয় এই খর্বাকার বৃক্ষ সাধারণত 15—20 ফুট দীর্ঘ হয়। নরম শাখাপ্রশাখাযুক্ত ঝোপালো এই বৃক্ষের ডালপালা নীচের দিকে ঝুলে থাকে। এদের পাতা বড় বিচিত্র ধরণের, দেখতে সাধারণ বটের মতো হলেও প্রত্যেক পাতা একটি করে ঠোঁঙায় পরিণত হয়েছে—দেখে মনে হয় যেন শালপাতার ঠোঁঙা। ভগবান কৃষ্ণ এই পাতার ঠোঁঙায় করে মাখন খেয়েছিলেন বলে অনেকেরই বিশ্বাস আর তার থেকেই এই রকম নামকরণ হয়েছে।

প্রকৃতির এই সৃষ্টি রহস্য উদ্ভিদজগতে এক আশ্চর্য বস্তু। পাতার এই ঠোঁঙায় রূপান্তর উদ্ভিদবিজ্ঞানে একে গাছের চারিত্রিক রূপ আখ্যা দেওয়া হয়েছে কারণ এই অনন্য সৃষ্টি রহস্যের অন্য কোন কারণ দেখা যায় না।

কৃষ্ণবট চিরসবুজ বৃক্ষ, আলঙ্কারিক উদ্ভিদ হিসাবে বাগানের পক্ষে বেশ মাননসই। ভারতের সমভূমির গরম ও নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় প্রায় সব ধরনের মাটিতেই বেঁচে থাকে তবে ভিজে দোঁয়াস মাটি এদের খুব পছন্দ। বর্ষায় গুটি কলমের মাধ্যমে সহজেই চারা তৈরি করা যায়, দীর্ঘদিন টবের মধ্যে চাষ করা চলে। কলকাতায় অনেকের বাড়ীর বাগানে ও নার্শারীতে একে দেখা যায়।

পাতার উপর ফুল

আমরা জানি ফুল সাধারণত গাছের ডালের আগায় বা পাতার কক্ষে কিংবা গুঁড়িথেকে পুষ্পদণ্ডের মাধ্যমে ফুটে থাকে কিন্তু পাতার মাঝখানে ফুল ফুটতে কি কখনো দেখেছো? কথাটা হেঁয়ালীর মতো মনে হলেও সম্পূর্ণ সত্য। হেলেঞ্জিয়া হিমালয়িকা নামের হিমালয়ের এই গুল্ম পাতার মাঝখানে অর্থাৎ পত্রফলকের মধ্যশিরার কেন্দ্রবিন্দুতে একসঙ্গে অনেকগুলো গুচ্ছাকার ফুল উৎপন্ন করে। ক্ষুদ্রাকার এই ফুল সবুজ-সাদা রঙের দেখতে ঠিক নাক-ছবির মতো। উদ্ভিদের এই অভিনব চরিত্র উদ্ভেদবিজ্ঞানে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এই ধরণের চরিত্র অন্য কোন গাছে দেখা যায় না।

এ্যরেলিয়েসী পরিবারের এই উদ্ভিদ তার প্রজাতির ঠাণ্ডা জায়গায় যেখানে শীতকালে 5°—15° সে.গ্রে. তাপমাত্রা থাকে সেখানেই জঙ্গলে একে সচরাচর দেখা যায়। এরা 4-5 ফুট দীর্ঘ হয়, সরু সরু ডালপালা, পাতা দেখতে কিছুটা টগর পাতার মতো, কিনারা সামান্য খাঁজকাটা, ফুল 1 সেমি লম্বা। ফুল মোটেই সুন্দর নয় তবে পাতার উপর ফুল ফোটার এই বিচিত্র ধর্মটাই এর কদর বাড়িয়ে তুলেছে, প্রায় সারা বছরই ফুল ফোটে।

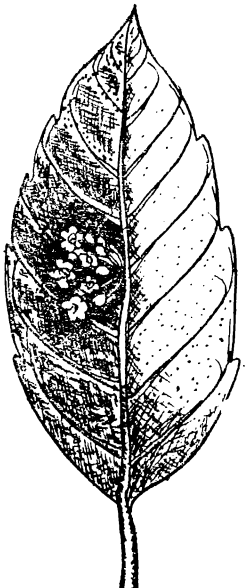

হিমালয়িকা হেলেঞ্জিকা

পাহাড়ের আর্দ্রতাপূর্ণ ঠাণ্ডা পরিবেশ এই গাছের পক্ষে আদর্শ। শাখা কাটিং থেকে অনায়াসেই চারা করা যায়। দার্জিলিং বোটানিকেল গার্ডেনে রক্ষিত হেলেঞ্জিয়ার গাছ সর্বশ্রেণীর পর্যটকের কাছে আকর্ষণীয় উদ্ভিদ।

উদ্যান ও কানন শাখা, কোচবিহার।

ভূগর্ভের রত্ন ঃ টোপাজ

'টোপাজ'কে আমরা বাংলায় বলে থাকি 'পোখরাজ'। এর অন্যান্য নাম পুষ্পরাগ, পুষ্পরাজ, পীতমান। টোপাজ এক মূল্যবান মণিপাথর। রাসায়নিক উপাদানের বিচারে এই খনিজটি হলো অ্যালুমিনিয়ামের সিলিকেট যৌগ, $Al_2SiO_4[F,(OH)_2]$। এর স্ফটিকের প্রকৃতি হলো 'অর্থোরম্বিক', মোজ স্কেলের মাপকাঠিতে কাঠিন্য 8। টোপাজের স্ফটিক প্রিজমাকৃতি ও স্বচ্ছ হয়। কখনও কখনও পিণ্ডাকারেও এই খনিজটি পাওয়া যায়। টোপাজ-এর স্ফটিক সাধারণতঃ স্বচ্ছ, ফিকে নীল অথবা হলুদ রঙের হয়ে থাকে। টোপাজের স্ফটিক ছোট হয়, আবার কয়েকশো পাউণ্ড ওজনের বিরাট-বিশালও হয়। গলিত ম্যাগমার গ্যাস কেলাসিত হয়ে টোপাজ সৃষ্টি করে। সাধারণত গ্রানাইট বা পেগমাটাইট শিলার ভেতর থেকে এই খনিজটি পাওয়া যায়। আবার কখনও কখনও কোয়ার্টজ সিস্ট বা কোয়ার্টজাইট পাথরের ভেতরেও একে দেখা যায়। ভারতের বিহার রাজ্যের সিংভূম জেলায়, মহারাষ্ট্রের ভাণ্ডারা জেলায় উৎকৃষ্ট মানের হালকা নীল রঙের টোপাজ পাওয়া যায়। এ ভিন্ন সিংভূম জেলার খরসোয়ান অঞ্চলের লাপসা-বুরুতে হাল্কা হলুদ রঙের টোপাজ মেলে। টোপাজের আপেক্ষিক গুরুত্ব 3·5, তার মানে খনিজটি মোটামুটি ভারিই বলতে হয়। ভারত ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য দেশ, যথা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, ব্রেজিল, নরওয়ে, আয়ারল্যাণ্ড, সুইডেন, জার্মানী, নাইজেরিয়া, শ্রীলঙ্কা, জাপান, ব্রহ্মদেশ, অস্ট্রেলিয়া, টাসমেনিয়া এবং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের উরাল পর্বতমালায় টোপাজ পাওয়া যায়। নিকৃষ্ট মানের টোপাজও ফেলা যায় না। ঘর্ষণ কাজের প্রয়োজনে তাকে লাগানো হয়।

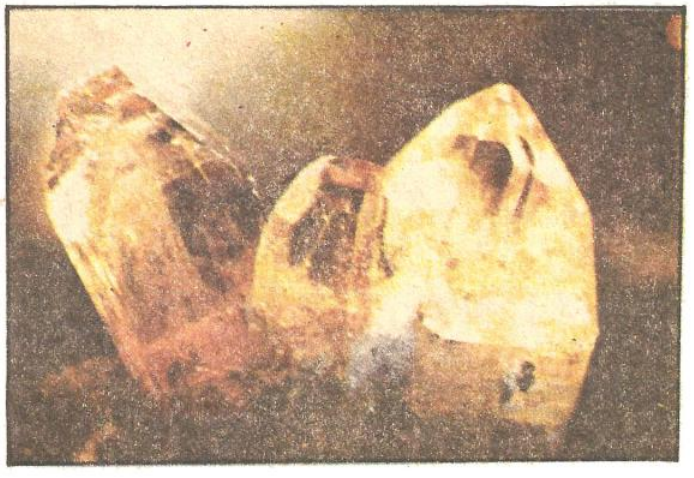

টোপাজ-এর রঙিন ছবি

অমরনাথ রায়

ফিঙে পাখি নিশ্চয়ই তোমাদের খুব চেনা। রেল-গাড়িতে চড়ে যাবার সময় রেল লাইনের ধারে টেলিগ্রাফের তারে দু ফাঁকে চেরা লেজখানি ঝুলিয়ে বসে থাকতে দেখেছ।

এই ফিঙে হচ্ছে দারুণ লড়াকু পাখি। ফিঙের বাসার আশপাশে কাক চিল বসতে পায় না। বাসার কাছাকাছি এলেই ফাইটার প্লেনের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের ঠুকরে তাড়িয়ে দেয়।

তাই যে গাছে ফিঙের বাসা তারই নিচের দিকে ডালে দোয়েল, হলদে পাখি বা ওই ধরনের একটু নিরীহ-গোছের পাখিরা বাসা বাঁধে কাক কিংবা হাঁড়িচাঁচার মতো চোর ছ্যাঁচড় পাখিদের হামলা থেকে বাঁচবার জন্য।

ফিঙে পাখিকে হিন্দীতে তাই বলা হয় কোতোয়াল —মানে পাহারাওলা।

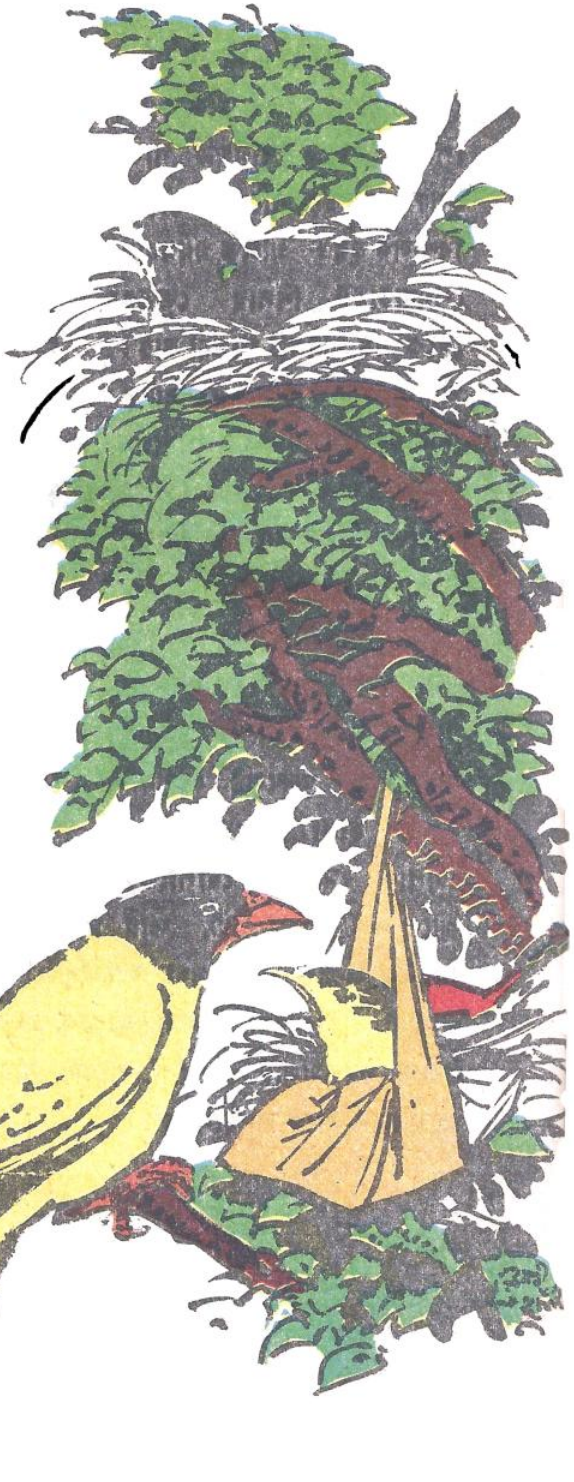

ছোটদের দপ্তর

পরিচালনায় জয়ন্ত দত্ত

ফেব্রুয়ারী ক্যুইজ কনটেস্ট-এর 12টি প্রশ্নের মধ্যে 10টি প্রশ্নেরও সঠিক উত্তর কেউ দিতে পারো নি। আগের মত এই বিষয়টিতে তোমরা বেশি সংখ্যায় অংশগ্রহণও করো না কেন?

বিষয়টিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য মে' সংখ্যা থেকে বয়স ও শ্রেণী অনুযায়ী ক্যুইজ কনটেস্টকে দুভাগে ভাগ করা হচ্ছে। এবং যুক্ত হচ্ছে রঙ্গীন ছবি। নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য 'সিনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট' এবং ষষ্ঠ—অষ্টম শ্রেণীর জন্য 'জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট' নতুন নাম নামকরণ হচ্ছে। রঙ্গীন ছবিসহ ক্যুইজ-এর নাম 'ফটো ক্যুইজ' যার জন্য থাকবে আলাদা পুরস্কার। মনে রেখো যে যেটার জন্য উত্তর পাঠাচ্ছ তার শিরোনামটি যেনো কেটে পাঠাতে ভুলো না।

ফেব্রুয়ারী '86 এর আই-কিউ-টেস্ট-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদানের জন্য আগে আসার ভিত্তিতে যে পাঁচ জন সার্টিফিকেটের জন্য নির্বাচিত হয়েছে ঃ

1. সুদীপ্ত সাহা, হিন্দু স্কুল, কলকাতা-700 073
2. সৌগত ঘোষ, সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল, কলকাতা-700 073
3. মিলন কুমার মুখার্জী, 78A, বিবেকানন্দ রোড, কলকতা-700 006
4. শেখ দারুল ইসলাম, 42/1B, সামসুল হুদা রোড, কলকাতা-700 017
5. বিনীতা লাহিড়ী, প্রযত্নে, বিমল কুমার লাহিড়ী, A/2, ঘোষপাড়া গভঃ ফ্ল্যাট, 52, সার্কুলার ফার্স্ট বাই লেন, হাওড়া-4

অনেক উত্তর সঠিক হওয়া সত্বেও তাদের নাম বিবেচনা করা গেল না, কারণ, তাদের উত্তর পত্রের সঙ্গে 'আই কিউ টেস্ট' কথাটি সংযুক্ত ছিল না। এ ছাড়া নামের সঙ্গে ঠিকানাও ছিলনা অনেকের। প্রথম পাঁচজনের পর সঠিক উত্তর দাতার সংখ্যাও অনেক।

আই-কিউ-টেস্ট Feb. '86-এর সমাধান

1. 10 2. 196 3. (a) 0 4. (c) উচ্চ তড়িৎ প্রবাহের সময় এই ধাতু দুটি সহজেই গলে যায়। 5. (c) ক্লোরোফিল প্রস্তুতিতে।

April 86-এ প্রকাশিতব্য।

ক্যুইজ কনটেস্ট ফ্রেব্রুয়ারী ঃ '86 এর সমাধান

1. 1—0 গোলে হারায় 1925 সালে। 2. স্থিরানুপাত সূত্র। 3. ICHTHYOLOGY 4. আমেরিকার 'ডক্টর জেমস নেইসবিথ'। 5. প্লুটোম্যানিয়া। 6. 640 কিলোমিটার। 7. 114টি। 8. লাল ও হলুদ রঙের এক রকম পোকা। 9. ভারতের সংবিধান। 10. 5টি। 11. ADI DASSLER-এর ব্যবসায়িক নাম। 12. BANDSAW।

নিজে নিজে কর

মডার্ন অ্যানসার ইণ্ডিকেটর

কুন্তল পাল

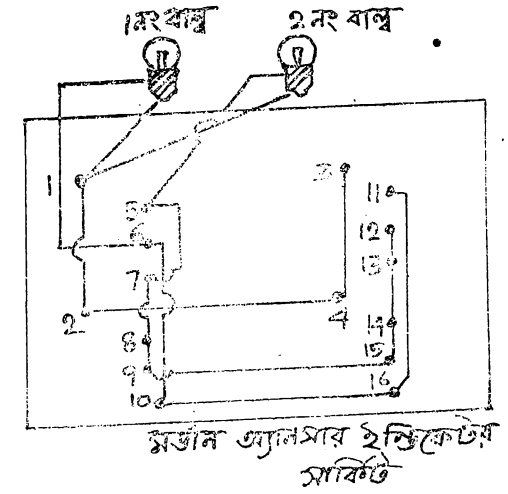

এই মডেলটা তৈরি করার প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ— (1) 30 cm × 20 cm × 5 cm মাপের কাঠের বা পিচ্‌বোর্ডের বাক্স, (2) দুটো টর্চের বাল্ব (3v), (3) লাল ও সবুজ সেলোফেন পেপার, 4) বোর্ডপিন (16টা), (5) 3v-এর ব্যাটারি বাক্স (6) 25 cm × 15 cm মাপের কিছু কাগজ, (7) তার।

প্রথমে একটা বাল্বে (চিত্রে 1 নম্বর বাল্ব) সবুজ ও অন্য বাল্বে (চিত্র 2নং) লাল সেলোফেন পেপার লাগাও। এবার এই বাল্ব দুটোকে বাক্সের বাকী অংশে চারটে পিন (1, 2, 3 ও 4) মাঝখানে বেশ খানিকটা ফাঁক রেখে বসাও। তারপর বাকী পিনগুলো (চিত্রে 5 থেকে 16) চিত্রের মত বসাও। এবার 1, 2, 3 ও 4 নম্বর পিনের পাশে একটা করে প্রশ্ন লেখ। এদের সঠিক উত্তর লেখ যথাক্রমে 6, 10, 11 ও 16 নম্বর পিনের পাশে। বাকী 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14 ও 15 নম্বর পিনের পাশে লেখ ভুল উত্তর। এরকম ভাবে একাধিক প্রশ্নপত্রও তৈরি করতে পার। এর জন্য 25 cm × 15 cm মাপের কাগজগুলো বাক্সের বাঁদিকে আঠা দিয়ে লাগাও। প্রতি কাগজের ওপর ষোলটা ফুটো এমনভাবে কর যাতে 1 থেকে 16 পর্যন্ত পিনগুলো দেখা যায়। এবার পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে প্রত্যেক কাগজে পিনের পাশে পাশে অন্যান্য প্রশ্নোত্তর লেখ। এবার বর্তনীতে হাত দেওয়া যাক্। 1, 2, 3 ও 4 নম্বর পিনগুলোকে সিরিজ কানেক্‌শানে যোগে কর। একই রকম ভাবে 6, 10, 11 ও 16 নম্বরের পিনগুলোকে এবং 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14 ও 15 নম্বরের পিনগুলোকে যোগ কর। এবার 6নং পিন থেকে একটা তার নিয়ে 1নং বাল্বের গায়ে ঝালাই করে দাও। 5নং পিন থেকে তার নিয়ে 2নং বাল্বের গায়ে ঝালাই কর। 1নং পিন থেকে দুটো তার নিয়ে 1নং ও 2নং বাল্বের নিচের অংশের সঙ্গে ঝালাই কর। কাজ শেষ। বর্তনীটা একবার ছবির সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে নাও। তবে মনে রেখ, এই সব কানেক-শানের তার যেন বাক্সের ভেতরেই থাকে। এবার ব্যাটারি বাক্সের ঋণ ও ধন অংশ থেকে দুটো তার বার কর। এর মধ্যে একটা প্রশ্নের পিনের গায়ে লাগাও আর অন্যটা প্রশ্নের নিচে লেখা তিনটে উত্তরের পাশে লাগানো পিনের গায়ে ক্রমান্বয়ে ছোঁয়াতে থাক। যদি সবুজ আলো জ্বলে ওঠে তবে বুঝবে সেই উত্তরটাই ঠিক। লাল আলো জ্বললে উত্তরটা ভুল।

প্রযত্নে ডি. ডি. পাল, ড্রয়িং অ্যান্ড ডিজাইন অফিস প্লান্ট III TELCO জামসেদপুর-10 অফিস ERCI) বিহার।

আই-কিউ টেস্ট
এপ্রিল—1986

1. কোনটি বে-মানান ? গ্লাস, প্লেট, চামচ, কাপ, চা।

2.

26	50	82	122	পরবর্তী সংখ্যাটি কত ?
37	65	101	?	

3. নিচের কোনটি উৎপাদনে ফসফরাসের ব্যবহার সর্বাধিক ? (a) দেশলাই (b) ফসফোরিক অ্যাসিড (c) ক্যালসিয়াম ফসফেট।

4. একটি ভাল্‌ভের কার্যপদ্ধতি নিচে লেখা কোনটির উপর নির্ভর করে ? (a) তাপবিদ্যুৎ (b) তাপীয় নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া (c) তাপীয় আয়ন।

5. চারটি বৃত্ত পরস্পরকে ছেদ করলে সর্বাধিক ছেদ-বিন্দু যা হওয়া সম্ভব তা হল
(a) 4 (b) 6 (c) 9 (d) 12 (e) এদের কোনটিই নয়।

[সমাধান প্রকাশিত হবে June '86 সংখ্যায়]

শব্দকুট / উৎপল শেঠ

সংকেত ঃ পাশাপাশি ঃ—
1. বংশগতির জনক
3. একটি তরল ধাতু
5. তরল পদার্থের স্বচ্ছতা পরিমাপক যন্ত্র।
7. ভারতের সর্ব পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়।
9. একটি নাইট্রোজেনবিহীন উদ্ভিদের রেচন পদার্থ।

উপর-নীচ ঃ—
2. পশ্চিমবঙ্গের একটি তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র।
4. যিনি ভারতে প্রথম ডাক ব্যবস্থার প্রচলন করেন।
6. শ্রীলঙ্কার রাজধানী।
8. ইটালীর বিখ্যাত নার্ভতত্ত্ববিদ।
10. ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন গুহামন্দির।

বাঁশবেড়িয়া, কুঁড়ুগলি বাঁশবেড়িয়া, হুগলী। Pin—712502

ক্যুইজ কনটেস্ট
April 1986

1. নিচের কোন্‌টি ডি. এন. এ. যুক্ত ভাইরাস ?
(ক) হাম (খ) ডেঙ্গু (গ) বসন্ত

2. শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ
"— একটি এনজাইমের নাম।"
(ক) লাইপেজ (খ) গ্লুকোজ (গ) রাইজোবিয়াম

3. মিশ্র ধাতু তৈরিতে কোন্ ধাতু অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও চৌম্বকত্বে লোহার পরেই কার স্থান ?

4. দাঁত বাঁধাতে ও এরোপ্লেনের যন্ত্রাংশ তৈরিতে কোন্ ধাতু সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে ?

5. পাশের ছবিটি কার ?

6. 'বা টা ভি য়া' শহর বর্তমানে কি নামে পরিচিত ?

7. কোন্ শহর থেকে Aerospace Daily নামক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ?

8. কোন্ দেশের জাতীয় বিমান সংস্থার নাম T. A. R. M. O. ?

9. নিচের ছবিটি কিসের ?

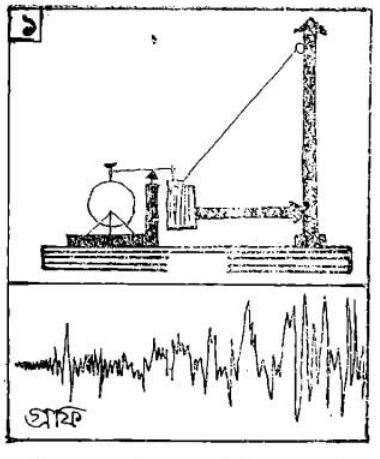

10. হকি ম্যাচে 'গোল নেট্' এর প্রবর্তন হয় কোথায় ও কতো সালে ?

11. Cricket Delightful গ্রন্থের রচয়িতা কে ?

12. সোনা কোন্ কোন্ ধরনের শিলায় পাওয়া যায় ?

[সমাধান থাকবে June '86 সংখ্যায়]

কিশোর রচনাবলী

জগদীশ চন্দ্র বসু

কিশোর রচনা সমগ্র ২৫·০০

সঙ্কলন ও সম্পাদনা : দিবাকর সেন

মেঘনাদ সাহা

কিশোর রচনা সঙ্কলন ১২·০০

সঙ্কলন ও সম্পাদনা

শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত

শার্লক হোমস-এর

কিশোর রচনা সমগ্র ২৫·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কিশোর রচনা সমগ্র ৩০·০০

ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য

রোমাঞ্চকর ২৫·০০

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তেপান্তর ২০·০০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কিশোর অপু ২০·০০

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বাঙলার ডাকাত

১—৪ ॥ ৩২·০০

ভ্রমণ রহস্য ও অভিযান

সুনির্মল বসু

রোমাঞ্চের দেশে ৬·০০

ধীরেন্দ্রলাল ধর

দুরন্ত যাত্রী ৮·০০

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

গঙ্গা যমুনা ৫·০০

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

আমাজনের অরণ্যে ৮·০০

শিশির ঘোষ

লাহুল সিংহের সন্ধানে ৬·০০

ফ্যাণ্টাসী ও মজার গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ঘনাদা ও মৌকাসাবিস ১৫·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

চারমূর্তি ১০·০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ঘনাদার জুড়ি নেই ১০·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ঝাউ বাংলোর রহস্য ৭·০০

কিশোর ক্ল্যাসিক্স্

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অপুর ছেলেবেলা ১০·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটদের সন্দীপন পাঠশালা ১০·০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ঘনাদা বিচিত্রা ২০·০০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটদের অপরাজিত ১০·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

টেনিদার অভিযান ২৫·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

রামধনু ১০·০০

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটদের কাজল ১০·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কম্বল নিরুদ্দেশ ৮·০০

সবার প্রিয় টেনিদা ১২·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটদের মজার গল্প ১০·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কিশোর রহস্য গল্প ১০·০০

কিশোর রোমাঞ্চ গল্প ১০·০০

ছোটদের মজার গল্প ১০·০০

ছোটদের বইয়ের স্বপ্নরাজ্য

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ

৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-৯

ইলেকট্রনিক ডোর বেল

মনোজ দাস

কিছু কিছু ছোট ছেলেমেয়ে আছে যাদের গায়ে হাত দেবার উপায় নেই। হাত দিলেই বেশ কিছুক্ষণ একটানা কান্না চালিয়ে যাবে। আমার এই মডেলটিও কিছুটা এই ধরণের। তবে তফাৎ এই যে কান্নার বদলে সুরেলা আওয়াজে কারোর আগমনবার্তা জানিয়ে দেয়।

এই মডেলটির বিশেষত্ব এর সুইচে। এখানে কোন সাধারণ সুইচ ব্যবহার করা হয় নি। একটি ধাতব চাকতি (যেটি দরজার বাইরে থাকবে) স্পর্শ করলেই আলোচ্য মডেলটি থেকে সুমধুর আয়াজ বেরিয়ে আসবে।

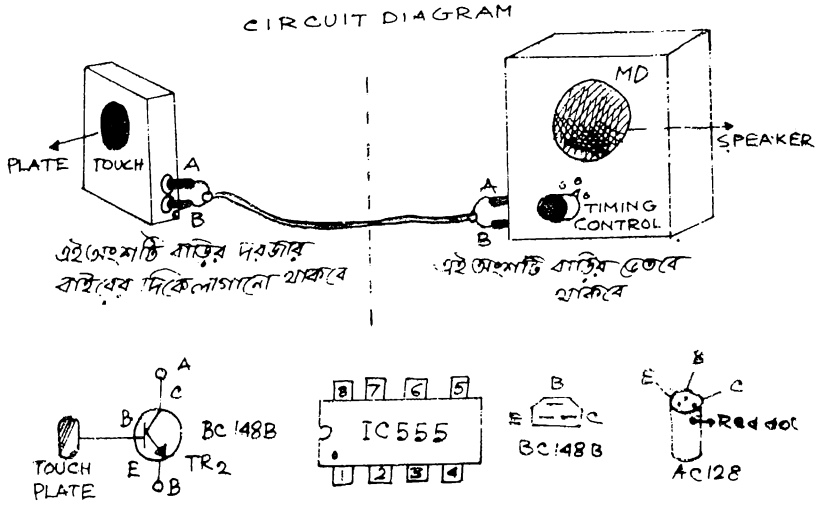

এই মডেলে দুইটি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (IC555) কে Oscillator হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। ধাতব প্লেটটিকে একবার স্পর্শ করে দিলে (কয়েক সেকেণ্ডের জন্য) A থেকে B প্রান্তের দিকে তড়িৎ-প্রবাহ ঘটবে। ফলে IC_1 একটি নির্দিষ্ট সময় (যা $-VR_1$ -পোটেনশিও মিটারটিকে ঘুরিয়ে পছন্দ মত ঠিক করা যায়) 1 থেকে 15 সেকেণ্ডের জন্য সক্রিয় থাকবে। এই সময়ে TR_2 ট্রানজিসটরটি অফ্ হয়ে থাকবে। ফলে IC_2 অন হবে এবং স্পীকার থেকে শব্দ শোনা যাবে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যা VR_1-কে ঘুরিয়ে ঠিক করে রাখা হয়েছিল। এই নির্দিষ্ট সময়ের পরে সমগ্র বর্তনীটি স্বয়ংক্রিয় ভাবে অফ্ হয়ে যাবে। এরপর বিদ্যুৎ খরচের কোন ভয় নেই। এটিকে 1V-এর একটি Eveready ব্যাটারিতে ভালোভাবে দীর্ঘদিন চালানো যায়। কারণ একবার স্পর্শের ফলে যদি 5 সেকেণ্ড ধরে আওয়াজ পাওয়া যায়, তবে দিনে অন্ততঃ 48 বার ব্যবহার করলেও প্রকৃতপক্ষে মোট 4 মিনিটের জন্য কার্যকরী থাকবে। কাজেই ব্যাটারী দীর্ঘস্থায়ী হবেই।

এখানে মনে রাখতে হবে, VR_1 পোটেনশিও মিটারটিকে ঘুরিয়ে ঠিক করে রাখার সময় ধরা যাক 5 সেকেণ্ড এর মধ্যে যতক্ষণ ইচ্ছা চাকতি স্পর্শ করে থাকলেও স্পীকার থেকে 5 সেকেণ্ড পর্যন্তই আওয়াজ বের হবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে চাকতি স্পর্শ করার সময় সর্বাধিক 1 থেকে 5 সেকেণ্ড। এর বেশি সময় ধরে চাকতি স্পর্শ করে থাকলে IC_1 টির পরবর্তী স্পন্দনের ফলে আরও 5সে. ধরে আওয়াজ পাওয়া যাবে। ধাতব চাকতিটিকে একটি ছোট কাঠের সুইচ বক্সের ওপর বসাতে হবে। এই চাকতিটি যেন অ্যালুমিনিয়ামের না হয় কারণ তাতে ঝালাই করা যাবে না আবার টিনের পাত হলেও জং ধরতে পারে। তাই তামার পাত ব্যবহার করাই সুবিধাজনক। এই সুইচ বক্সের ভেতরেই TR_1 ট্রানজিস্টারটি থাকবে ও এথেকে দুটি তার A ও B বেরিয়ে আসবে যা বাড়ির ভেতরের বাক্সের A ও B প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। এই বাক্সটিকে এমন জায়গায় বসাতে হবে যাতে বাড়ীর সব জায়গায় থেকে ভালভাবে আওয়াজ শোনা যায়। VR_1-এর সঙ্গেই অন্-অফ্ সুইচ আছে। কোন কারণে মডেলটিকে বন্ধ রাখার প্রয়োজন হলে এটিকে ব্যবহার করতে হবে।

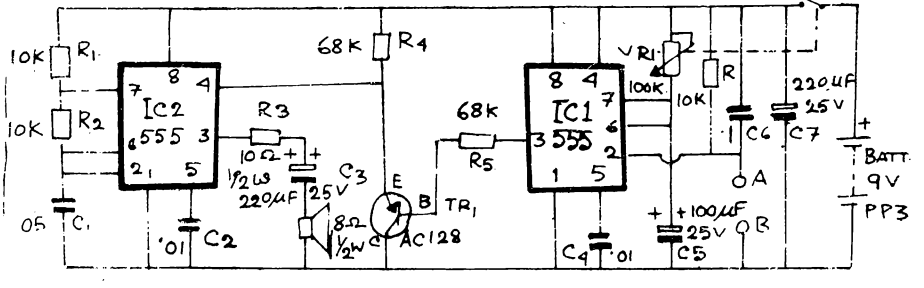

গ্রাম+ডাকঘর—রঘুদেবপুর, জেলা—হাওড়া।

প্রশ্নোত্তর

প্রঃ—শব্দদূষণ কি ? শব্দদূষণ মানুষের কতখানি ক্ষতি করে ? এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কি ? দিব্যেন্দু চক্রবর্তী আগরতলা।

উঃ—শব্দদূষণ আজকের সারাবিশ্বে এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। বিশেষজ্ঞদের মতে জল, বায়ু মাটি ইত্যাদির দূষণ অপেক্ষাও মারাত্মক শব্দদূষণ। বিজ্ঞানীরা বলেন উচ্চ যেকোন ধরণের শব্দ মানুষের মন ও শরীর উভয়কেই বিপর্যস্ত করে দেয়। যাঁরা শব্দবহুল এলাকায় বাস করেন, তাঁরা হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসের নানা রোগে আক্রান্ত হন। শুধু কি তাই ? ক্ষুধামান্দ্য, পাকস্থলীর প্রদাহ, রক্তচাপবৃদ্ধি, বধিরতা, চোখের রোগ, একজিমা প্রভৃতি নানা রোগ আসে তীব্র শব্দ শ্রবণের ফলে। আরও মনে করা হয়, উচ্চ শব্দ মাত্রেই মাতৃগর্ভস্থ শিশুর প্রচণ্ড ক্ষতি করে। শিশু বিকলাঙ্গ ও বিকৃতমস্তিষ্ক হয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং অনেকসময় অতি তীব্র শব্দের প্রতিক্রিয়ায় মাতৃগর্ভে মৃত্যুবরণ করে।

উচ্চশব্দ আমাদের সামাজিক জীবনকেও বিপর্যস্ত করছে বলে প্রায় সমস্ত বিজ্ঞানীই অভিমত প্রকাশ করে থাকেন। উচ্চ শব্দের পরিবেশে মানুষ মানসিক সুস্থিরতা হারায় এবং তার ফলে ভয়ানক খিটখিটে হয়ে পড়ে। এই থেকেই সূত্রপাত হয় দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধানোর প্রবণতা, আচর আচরণে উগ্রতা উচ্ছৃংখলতা পারিবারিক অশান্তি প্রভৃতি অনেককিছু। আজকের দিনে সমাজে যে উচ্ছৃংখলতা প্রকাশ পাচ্ছে তার মূলে উচ্চ শব্দ অন্যতম কারণ হিসাবে অনেকে উল্লেখ করতে চান। তাঁরা আরও মনে করছেন, শহরে যেভাবে উচ্চ শব্দ ছড়ানোর প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে মানুষের শান্তিপূর্ণ সুখী সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে এবং মানুষের অস্তিত্বকেও পর্যন্ত বিপন্ন করবে। সুস্থ-চিন্তাশক্তি বিঘ্নিত হয়ে কেবল অপরাধ প্রবণতা বেড়ে চলবে।

ভবিষ্যতের ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে এখনই ধনী রাষ্ট্রগুলি অজস্র অর্থব্যয়ে নানা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। তারা মোটরগাড়ীর গতি নিয়ন্ত্রণ করেছে, নিষিদ্ধ করেছে গাড়ীর তীব্র হর্ণ ও পুরাতন ইঞ্জিনের ব্যবহার, ব্যবস্থা করেছে বাসগৃহের জানালায় কাচের পাল্লা ও ভারী পর্দায়, কোলাহপূর্ণ এলাকায় শব্দ শোষক ফোম ইত্যাদি অনেককিছু। কিন্তু আমাদের মত উন্নতিকামী দেশের খরচ করার মত এত অর্থ নেই। তাই নিজেদেরই সচেতন হতে হবে এবং শব্দদূষণ রোধ করতে হবে। পরিহার করতে হবে জোরে জোরে রেডিও এবং মাইক বাজানো, স্টিরিওফোনিক শব্দ, বোমপটকা ফাটানো ইত্যাদি। এমনকি জাতীয় উৎসব ও পূজাপদ্ধতিতে ঢাক-ঢোল-কাঁসির ও মাইকের ব্যবস্থা সীমিত করতে হবে। হৈ-হুল্লোড়, চিৎকার—চেঁচামেচি যাতে না হয় তারও চেষ্টা করতে হবে। আর মোটরগাড়ীর আরোহীদের লক্ষ্য রাখতে হবে চালক যেন দ্রুত গাড়ী না চালায় এবং জোরালো হর্ণ যেন ব্যবহার না করে। বর্তমান দূরপাল্লার গাড়ীতে আবার ভিডিও এবং টেপরেকর্ডারকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এযে আরোহীদের পক্ষে কত ক্ষতিকর তা চিন্তা করলে গা শিউরে ওঠে। অথচ এমন আমাদের মানসিকতা গড়ে উঠেছে যে, দ্রুতবেগে গাড়ী না ছুটলে তৃপ্তি পাইনা গানের নামে তীব্র কোলাহল না হলে স্বস্তি লাভ করিনা।

তোমরাই আগামীদিনের দেশসংগঠক ও দেশের ভবিষ্যৎ। একমাত্র তোমরাই পার শব্দদূষণ রোধ করতে। মাইকের গগনবিদারী চিৎকার, রেডিওর উচ্চ-শব্দ, পূজা-পদ্ধতি ও দেওয়ালীর বোম পটকা ফাটানো একেবারে বন্ধ করে ফেলতে পার।

বিশ্বস্বাস্থ্য-সংস্থা জানিয়েছেন, শব্দের তীব্রতা দিনের বেলায় 45 ডেসিবেল এবং রাত্রে 35 ডেসিবেলের বেশি হওয়া উচিত নয়। তীব্রতার মাত্রা 80 ডেসিবেলে ঠেকলে শরীরের স্থায়ী ক্ষতির সম্ভাবনা। মনে রাখবে পুরো ভল্যুম খুলে রেডিও বাজালে তীব্রতার মাত্রা 80 ডেসিবেলকে ছাড়িয়ে যায়। চিৎকার-চেঁচামেচিতে তীব্রতা হয় 90 ডেসিবেল, গাড়ীর হর্ণে হয় 100 ডেসিবেল, মাইক বাজালে 110 ডেসিবেলকে ছাড়িয়ে যায়, জেট বিমানের ও বোমপটকার শব্দ 120 ডেসিবেলের বেশি। অতএব নিজেদের বাঁচার তাগিদে নিজেদেরই সাবধান হতে হয়।

তবে এও সত্যি যে, তীব্র শব্দ-সহ্য করার শক্তি সবার সমান নয়। সাধারণত ছোটরা, স্ত্রীলোকেরা এবং কোন কোন পেশার বয়স্করা তীব্র শব্দকে সহ্যকরার ক্ষমতা রাখে। তা সত্ত্বেও শব্দের তীব্রতাকে কখনও 70 ডেসিবেলের উপরে তুলতে নেই এবং এই শব্দ সাধারণভাবে রেডিও বাজানোর শব্দ এবং একে অপরের সঙ্গে কথা বলার চেয়ে সামান্য বেশি।

প্রঃ—প্লাস্টিক সার্জারী কি এবং কে আবিষ্কার করেছেন ? অমিত চট্টোপাধ্যায়, 28/13 জয়দেব এভিনিউ-দুর্গাপুর 5। এবং অভিজিৎ মজুমদার-গুয়াহাটি—11।

উঃ প্লাস্টিক সার্জারী একধরণের শল্যচিকিৎসা। বাংলায় বলা হয় পুনর্গঠনিক শল্যচিকিৎসা। সাধারণত পঙ্গু ও বিকলাঙ্গদের দেহসৌষ্ঠবকে ফিরিয়ে আনতে উক্ত-পদ্ধতিটির সাহায্য গ্রহণ করা হয়। তবে অকেজো হৃৎপিণ্ড, চোখ ইত্যাদিকে পরিবর্তন করে নতুন অঙ্গের

যোজনা তথা অধিরোপন প্রণালীও প্লাস্টিক সার্জারীর আওতায় পড়ে।

উক্ত-শল্যচিকিৎসায় শরীরে ক্ষতের গভীরতা অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। চামড়ার সাধারণত তিনটি স্তর থাকে। কোন ক্ষতের দাগ যদি দ্বিতীয়স্তর অবধি বিস্তৃত হয় তাহলে ক্ষতস্থানকে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে পরিষ্কার করে বাণ্ডেজ বেঁধে দিলেই নতুন চামড়া গজিয়ে ক্ষতস্থানকে মসৃন করে দেয়। কিন্তু ক্ষতস্থান যদি গভীর হয় অথবা শরীরের কোন স্থান যেমন নাক, কান, ঠোঁট ইত্যাদি কাটা যায়, তাহলে শরীরের পেশীবহুল স্থান থেকে মাংস গ্রহণ করে ক্ষতস্থানকে পুনর্গঠন করা হয়।

পাশ্চাত্যে প্ল্যাস্টিক সার্জারীর প্রথম সূত্রপাত করেন আইভার সন নামে একজন ডাক্তার। কথিত আছে, এক রেডইণ্ডিয়ান যুবকের দ্বারা উল্কি কাটানো এবং উল্কির দাগ তোলা দেখে তিনি অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন এবং চিকিৎসাসম্মত উপায়ে ক্ষতস্থানকে পরিষ্কার করে প্রথম মুখে বসন্তের দাগে ভর্তি এক তরুণীর মুখশ্রী ফিরিয়ে এনেছিলেন। পরের দিকে অন্যান্য চিকিৎসকদের হাতে পড়ে পদ্ধতিটি আরও উন্নত ও জনপ্রিয় হয়ে উঠে। বর্তমানে পদ্ধতিটির এত উন্নতি হয়েছে যে, কেবলমাত্র পঙ্গু ও বিকলাঙ্গদের অঙ্গের পুনর্গঠন করছে না অকেজো হৃৎপিণ্ড, চোখ ইত্যাদিকেও বদল করে দিচ্ছে। ফলে চিকিৎসা শাস্ত্রের হয়েছে প্রভূত উন্নতি।

এখানে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় যে, প্লাস্টিক সার্জারী পাশ্চাত্যে নতুন হলেও ভারতে বহু আগে উদ্ভূত হয়েছিল। ভারতের সুপ্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্র সুশ্রুত সংহিতায় পদ্ধতিটির উল্লেখ আছে। ওর নাম দেওয়া হয়েছিল 'শল্যতন্ত্র পদ্ধতি'। গাল থেকে মাংস কেটে এনে কর্তিত নাসা ও কর্ণের-যে পুনর্গঠন করা হতো এমন উল্লেখ কেবলমাত্র সুশ্রুত সংহিতা নয়, সুপ্রাচীন বাহু সংহিতা গ্রন্থে আছে। মনেহয়, চক্ষু অধিরোপন প্রণালীও অজানা ছিলনা। ভারতে ইংরাজ রাজত্বের গোড়ার দিকেও প্রচলিত ছিল উক্ত পদ্ধতি। শেষ দৃষ্টান্ত টিপু সুলতানের আমলে পাওয়া যায়। কথিত আছে, টিপুর নির্দেশে এক শকট চালকের নাক ও কান কাটা যায়। শকটচালকটি কোন এক শল্যচিকিৎসকের কাছ থেকে নাক কানের কর্তিত অংশকে পুনর্গঠন করে এনেছিলেন।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের নিজেদের অকর্মণ্যতার জন্য পদ্ধতিটির হারিয়ে গেছে এবং হারিয়ে গেছে আরও কত মূল্যবান জিনিস। সেগুলির উদ্ধারেরও কোন প্রচেষ্টা হচ্ছে না। একটু যা সুখের কথা, পাশ্চাত্য ভারতীয় প্রাচীন এই চিকিৎসাপদ্ধতিটিকে স্বীকার করে নিয়েছে। তাই কর্তিত নাসার পুনর্গঠন পদ্ধতির নাম রাখা হয়েছে 'ইণ্ডিয়ান রাইনো প্লাস্টি।'

প্রঃ—ক্লোরোফর্ম কি তরল পদার্থ? সাধারণ মদ থেকে কি ওকে তৈরি করা যাবে? সুবীরকুমার রায়—হেমচন্দ্র স্ট্রীট, খিদিরপুর।

উঃ ক্লোরোফর্ম তরল পদার্থ। সুমিষ্ট স্বাদ ও গন্ধ-যুক্ত কিন্তু জলে দ্রবীভূত হয়না।

রসায়নাগারে ক্লোরোফর্মকে তৈরি করতে হলে 400 সি.সি. জল 100 গ্রাম ব্লিচিং পাউডার ও 95·6% বিশুদ্ধ ইথাইল অ্যালকোহলের 25 সি.সি. নিয়ে একত্রে লেই প্রস্তুত করতে হয়। মদে তো ইথাইল অ্যালকোহল আছে, শুধু দেখতে হবে ওতে অ্যালকোহলের পরিমাণ কতটুকু! বাকিটা জল দিয়ে অথবা জল না দিয়ে ব্লিচিং পাউডারের সঙ্গে মিশিয়ে লেই প্রস্তুত করলেই হবে।

প্রঃ গাড়ী থেকে পাকা রাস্তার উপর তেল পড়লে নানা রঙের বিচ্ছুরণ ঘটে কেন? আজীজুর রহমান গায়েন, সোনারপুর-24 পরগনা।

উঃ পাকারাস্তায় অথবা ভিজে জায়গায় তেল পড়লে সূর্যের সাদা আলোর বিচ্ছুরণ ঘটে এবং বিচ্ছুরণের ফলে সাতটি বর্ণ-পৃথক হয়।

প্রঃ সূর্য কতটা গরম? শ্যামল ব্যানার্জী 3A/3 শ্রীনগরপল্লী-দুর্গাপুর-13।

উঃ সূর্যের কেন্দ্রে তাপমাত্রা প্রায় দুকোটি ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড এবং পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা 6000 ডিগ্রী সেণ্টি-গ্রেডের মত।

প্রঃ বৃদ্ধ বয়সে মানুষের বুদ্ধিলোপ পায় এবং মেজাজ খিটখিটে হয় কেন?

দেবাশীষ মান্না, আন্দুল—জোড়হাট-হাওড়া।

উঃ শেষ বয়সে মানুষের মস্তিষ্কের নিউরোনগুলো নষ্ট হয়ে যায়। তাই সুস্থ চিন্তাশক্তির হ্রাস ঘটে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থায় সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেনা। অপরদিকে দুঃখ, শোক, হতাশা অতৃপ্ত কামনা পারিবারিক অশান্তি ইত্যাদিও থাকে। জীবনের শেষ দিনগুলিতে হিসেব মেলাতে গিয়ে অধিকাংশ মানুষ অনেকক্ষেত্রে নিজের ব্যর্থতাই দেখতে পায়। যাকে সার্থক করে তোলার সময় তখন আর থাকেনা। বয়স্কদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব এবং তাঁদের ইচ্ছাকে ফলবতী করার প্রচেষ্টা চালালে খিটখিটে মেজাজ অনেকাংশে লোপ পাবে।

প্রঃ নেপচুনের দুটি চন্দ্র এবং শনির সবচেয়ে কছের ও দূরের চন্দ্রদুটি কি কি? শনির বলয় কটি এবং কিভাবে বলয় সৃষ্টি হয়েছে? জয়শ্রী ধর, চন্দননগর-হুগলী।

উঃ নেপচুনের চন্দ্রদুটির নাম ট্রাইটন ও নেরিড। শনির 9টি চাঁদের নিকটতমটির নাম মিমাস ও দূরতমটির নাম ফিবি। শনির বলয় তিনটি। এর উপাদান ছোট-

বড় বস্তু খণ্ড। মৌমাছির ঝাঁকের মত চারদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, শনির কোন একটি উপগ্রহ একালে তার সন্নিকটবর্তী হওয়ায় ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে এই অবস্থায় এসেছে। 1850 খ্রীস্টাব্দে জ্যোতির্বিজ্ঞানী রচি প্রমান করেছেন, গ্রহকে প্রদক্ষিণরত উপগ্রহ যদি গ্রহটির ব্যাসার্ধের 2·45 গুণ দূরে এসে পড়ে তাহলে উপগ্রহটি ভেঙ্গে যাবে এবং বলয়ের সৃষ্টি করবে। শনি আকারে অনেক বড়। অতীতে তার আরও একটি ছোট উপগ্রহ ছিল। সেটি শনির আকর্ষণে ধীরে ধীরে সন্নিকটবর্তী হতে হতে একদিন ভেঙ্গে-লিরে বলয়ে পরিণত-হয়েছে। মিমাস এখন শনির ব্যাসার্ধের মাত্র 3·1 গুণ দূরে রয়েছে। সেও একদিন অনুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হবে।

প্রঃ বাদুড় অন্ধকারে চলাফেরা করে কিভাবে? পবিত্র ঘোষ, বাপ্পা ঘোষ, শম্পা ঘোষ প্রভাত ঘোষ, রাশু নন্দী। কেশবপুর মহেন্দ্র ইনস্টিটিউশান, হুগলী।

উঃ উত্তরটি আগে দেওয়া হয়েছে। তবু সংক্ষেপে জানাই যে, বাদুড় ওড়বার সময় শব্দোত্তর তরঙ্গের সৃষ্টি করে। সেই তরঙ্গ যে কোন প্রতিবন্ধকে বাধা পেয়ে ফিরে এলে তাদের কানে-ধরা পড়ে। তাই পথ চিনতে তাদের অসুবিধা হয়না।

প্রঃ কয়লা ও রোপওয়ের আবিষ্কারকের নাম জানতে চেয়েছো কৃত্তিনগর নদীয়া থেকে মৌসুমী চ্যাটার্জী ও বালী সাহেববাগান, হাওড়া থেকে শর্বরী দাস।

উঃ দুটিই প্রাগৈতিহাসিক যুগের আবিষ্কার। তাই আবিষ্কারকের নাম পাওয়া যাবে না।

কালিন্দী, মেদিনীপুর।

মার্চ '86 সংখ্যার শব্দকূটের সমাধান

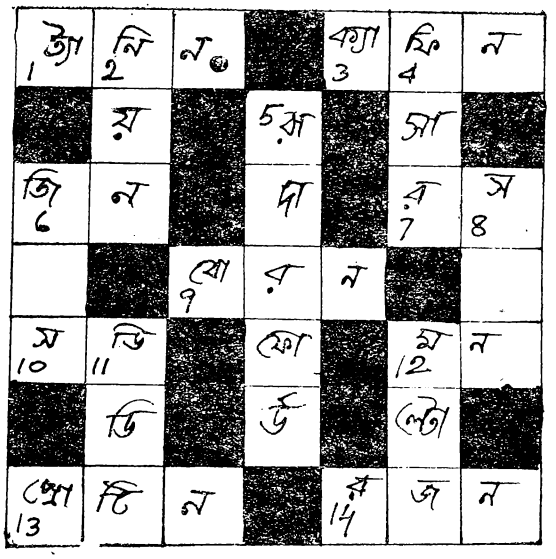

অটোগ্রাফসহ গ্রন্থ উপহার

ফেব্রুয়ারী সংখ্যার 'ক্যুইজ কনটেস্ট'-এর ফলাফল প্রকাশিত হল। এপ্রিল সংখ্যার উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ 30শে এপ্রিল। সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আগে আসার ভিত্তিতে তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। এ মাসের উপহার :

অজয় হোমের : বিচিত্র জীবজন্তু

পরিচালক : ছোটদের দপ্তর

জগদীশচন্দ্র বসু
কিশোর
রচনাসমগ্র

বিজ্ঞানসাধক জগদীশচন্দ্রের প্রথম বাংলা গ্রন্থ 'অব্যক্ত'। পরবর্তী 'প্রবন্ধাবলী'। কেবলমাত্র 'অব্যক্ত' ও 'প্রবন্ধাবলী'র কিশোরপাঠ্য রচনাই নয়, জগদীশচন্দ্রের আরও অনেক গল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, চিঠিপত্র ও বক্তৃতাবলী বর্তমান সঙ্কলনে প্রকাশিত হল যা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। বহু দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র-সমৃদ্ধ গ্রন্থটির দাম ২৫ টাকা।

সঙ্কলন ও সম্পাদনা
দিবাকর সেন

আজকের দিনের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে হাতেকলমে কাজ করা (Work Education) তো শিক্ষাপদ্ধতির অন্যতম অঙ্গ হিসেবেই বিবেচিত। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয় পর্যায়ের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকেই নিজের হাতে একটা কিছু তৈরী করতেই হবে।

জয়ন্ত দত্ত সঙ্কলিত

নিজে নিজে কর

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগে এমন অনেক জিনিসই আমাদের ছেলেমেয়েরা তৈরী করতে আগ্রহী হলেও তেমন নির্দেশমূলক বই কোথায়? কিছুটা সেই অভাব মেটাবার জন্যই প্রকাশিত হল—'নিজে নিজে কর'। আচার্য জগদীশ-চন্দ্র বসুর ও গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের কয়েকটি মডেলসহ অজস্র মডেলের সচিত্র নির্মাণপ্রণালী। দাম ১০·০০

জনপ্রিয় স্তরে বিজ্ঞানসংক্রান্ত বহু লেখা লিখেছেন ডঃ মেঘনাদ সাহা। বক্তৃতাও দিয়েছেন বাংলা ও ইংরাজীতে। তবে ছোটদের জন্য তাঁর লেখা প্রথম প্রকাশিত শিশু-ভারতীতে।

প্রধানতঃ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তেরই অনুরোধে তিনি ছোটদের জন্য কলম ধরেছিলেন। পৃথিবীর আয়তন, অভিযান, আবিষ্কার ও গবেষণা-মূলক ডঃ সাহার সেই সব রচনা শুধু কিশোর নয়, আজকের দিনের বয়স্ক পাঠকেরও কৌতূহলের বিষয়। সেই সব রচনার সংগে যুক্ত হয়েছে মেঘনাদ সাহার অপ্রকাশিত পত্রা-বলী। দুর্লভ আলোকচিত্রসমৃদ্ধ গ্রন্থটির দাম ১২·০০।

মেঘনাদ সাহা
কিশোর
রচনাসঙ্কলন

সম্পাদনা করেছেন
শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় ও
এনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

R/No 37390/81 KISHORE JNAN-BIJNAN 6 th Yr Vol –11· APRIL 1986/Regd.No. WBEC/25

ক্লাস অ্যানুয়ালে বেশী নম্বরের জন্য

অমরনাথ রায়	॥	সায়েন্স ক্যুইজ	১০
অলক চক্রবর্তী	॥	ফিজিক্স ক্যুইজ	১০
অমরনাথ রায়	॥	নলেজ ক্যুইজ	১০
অরূপরতন ভট্টাচার্য	॥	গণিত ক্যুইজ	১০
অমরনাথ রায়	॥	কেমিস্ট্রী ক্যুইজ	১০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ । ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮৬/১মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯থেকে প্রকাশিত এবং, ৮এ, দীনবন্ধু লেন, কলকাতা-৬, নিউ জয়কালী প্রেস থেকে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ ও রঙিন পাতা মুদ্রণ ক্যালকাটা আর্ট ষ্টুডিও প্রাঃ লিঃ কলিকাতা ১২

মূল্য– তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র